কলকাতা লিটল ম্যাগাজিন মেলা সংখ্যা ২০০৯
বর্ষ বাইশ (জানুয়ারি - মার্চ), ২০০৯

সম্পাদক - বিশাল ভদ্র

সাম্প্রদায়িক ধর্মবুদ্ধি মানুষের যত অনিষ্ট করেছে এমন বিষয়বুদ্ধি করেনি । বিষয়াসক্তির মোহে মানুষ যত অন্যায়ী যত নিষ্ঠুর হয়, ধর্মমতের আসক্তি থেকে মানুষ তার চেয়ে বেশি ন্যায়ভ্রষ্ট অন্ধ ও হিংস্র হয়ে ওঠে... তার সর্ব -নেশে প্রমাণ ভারতবর্ষে আমাদের ঘরের কাছে প্রতিদিন যত পেয়ে থাকি এমন আর কোথাও নয় '
--রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্লক-৫, ফ্ল্যাট-৭২, পি-১৯, সাদার্ন অ্যাভিনিউ
কলকাতা - ৭০০ ০২৯

☎

দূরভাষ - ২৪৬৩-০৯০৭
সঞ্চারিণী - ৯৮৩১১৬৪২২৭
E-Mail :- kanakodikolkata@yahoo.co.in

— সূ চি প ত্র —

প্রবন্ধ

U ডঃ অনুরূপা মুখোপাধ্যায় সাঁওতালি ভাষার মান্যীকরণ
U তুষার রায় কথায় কথায়
U শৈবাল চক্রবর্তী ভারতী সিদ্ধি
U বিষ্ণু বিশ্বাস অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় - একটি সংক্ষিপ্ততম পরিচয়

গল্প

U লীনা চাকী খেলা
U তাপস রায় একটি ব্যক্তিগত গদ্য

ক বি তা

U যশোধরা রায়চৌধুরী
U সংহিতা বন্দ্যোপাধ্যায়
U সুমিত চট্টোপাধ্যায়
U দেবাশিস চট্টোপাধ্যায়
U শক্তিব্রত চক্রবর্তী
U সুবীর ঘোষ
U তাপস সরদার
U সোনালি বেগম
U কণিকা চট্টরাজ
U অশোক মুখোপাধ্যায়
U রথীন কর
U স্বপন বক্সী
U কানাইলাল জানা
U বিশাল ভদ্র

ভাবান্তর

U খোন্দকার ফয়জুল আলিম খলিল জিব্রানের 'শয়তান'

ক্রোড়পত্র

U কবিতা কবিতা (হুগলি জেলা)

U **অক্ষর বিন্যাস** — কানাকড়ি

ডঃ অনুরূপা মুখোপাধ্যায়

সাঁওতালি ভাষার মান্যীকরণ

''আদিবাসীরাই ভারতের প্রকৃত স্বদেশী বা প্রাচীনতম অধিবাসী, তাদের কাছে আর সকলেই বিদেশী। এই প্রাচীন জাতির নৈতিক দাবী ও অধিকার হাজার হাজার বছরের পুরানো।''

কথাটা একেবারেই সত্যি হলেও দুঃখের বিষয় ভারতীয় সভ্যতা ও ভারতের ইতিহাস আজ পর্যন্ত আদিবাসীদের এবং সেই সঙ্গে জনসাধারণের ইতিহাসকেও স্বীকৃতি দেয় নি। এই বাস্তব সত্যটাকে স্বীকার না করে উপায় নেই। এই রকমভাবে স্বীকার করতে হবে যে, সাঁওতালি ভাষার মত একটি ঐতিহ্যময়, প্রাচীন, সংবিধান স্বীকৃত ভাষার মান্যীকরণ এখনো সম্ভবপর হয় নি।

যে কোন ভাষার ক্ষেত্রেই আঞ্চলিক ভিত্তিতে বিভিন্ন শব্দের ব্যবহার ও উচ্চারণগত বহু রকমের অল্পবিস্তর পার্থক্য থাকে। যেমন- বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে কলকাতা ও নদীয়ার প্রচলিত কথ্য ভাষার সঙ্গে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলার কথ্য ভাষার উচ্চারণের ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিত। স্বভাবতই জীবিকার খোঁজে সাঁওতালরা বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। আবার বিভিন্ন অঞ্চলের জলবায়ু আর সামাজিক পরিবেশের প্রভাবে বিভিন্ন অঞ্চলের কথাবার্তায় বেশ কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সাঁওতালি ভাষার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

কিন্তু আঞ্চলিক ভিত্তিতে বিভিন্ন শব্দের ব্যবহার ও উচ্চারণগত বহু পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও বাংলা সাহিত্যে যে রকম প্রধানত নবদ্বীপ, শান্তিপুর অঞ্চলে ব্যবহৃত ও উচ্চারিত বাংলা শব্দই প্রাধান্য পেয়েছে(সাঁওতালি ভাষার ক্ষেত্রে কিন্তু তা ঘটেনি। ভাষার ক্ষেত্রে লিখিত সাহিত্যের মধ্যে সংহতি থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সাঁওতালি ভাষার বিকাশের প্রধান অন্তরায় হলো লিখিত সাহিত্যের মধ্যে সংহতির অভাব।

সাঁওতালরা দীর্ঘকাল যাবৎ ভারতের প্রধানত পাঁচটি রাজ্যে বসবাস করছে। স্বাভাবিক কারণে সাঁওতালি ভাষায় আঞ্চলিক ভাষার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। পশ্চিমবঙ্গের সাঁওতালিতে বাংলা ভাষার প্রভাব, বিহার ও ঝাড়খন্ডে হিন্দীর প্রভাব, উড়িষ্যায় ওড়িয়া ভাষার প্রভাব ও আসামে অসমিয়া ভাষার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। প্রথম দিকে সাঁওতালদের মধ্যে শিক্ষার হার সেভাবে প্রসারিত না হওয়ার ফলে স্বভাবতই সাঁওতালরা আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে এবং সাঁওতালি ভাষা নিয়ে মৌলিক চিন্তাভাবনাও সেভাবে হয় নি। এই প্রাদেশিক ভাষা নির্ভরতা এখনও সাঁওতালদের মধ্যে সমভাবে বর্তমান। এক একটি ভাষা এক একটি জনগোষ্ঠীর নিজস্ব প্রকাশ মাধ্যম। কিন্তু এক একটি

ভাষা সম্প্রদায় যে ভাষার মাধ্যমে ভাববিনিময় করে, সেই ভাষারও রূপ সর্বত্র সম্পূর্ণ একরকম নয়। যেমন - পূর্ব বাংলা (বাংলাদেশ) এবং পশ্চিমবাংলায় বাংলা ভাষাই প্রচলিত, কিন্তু পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার উচ্চারণ ও ভাষারীতি পুরোপুরি একরকম নয়। একই ভাষার মধ্যে এই যে আঞ্চলিক পার্থক্য একে বলে আঞ্চলিক উপভাষা। উপভাষার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে—

"A specific form of a given language, spoken in a certain locality or geographic area, showing sufficient differences from the standard or literary form of that language, as to pronunciation, grammatical construction and idiomatic usage of words, to be considered a distinct entity, yet not sufficiently distinct from other dialects of the language to be regarded as different language."

অর্থাৎ একই ভাষার মধ্যে আঞ্চলিক পৃথক রূপকে উপভাষা বলে। তবে ভাষা ও উপভাষার মধ্যে পার্থক্যটি চূড়ান্ত নয়, আপেক্ষিক। এই আপেক্ষিকতার কথা মনে রেখেও কেউ কেউ বলেছেন —''একই ভাষাভাষী এলাকার অন্তর্গত একাধিক অঞ্চলের ভাষার আঞ্চলিক রূপের মধ্যে যতদিন পর্যন্ত পারস্পরিক বোধগম্যতা (mutual intelligibility)) থাকে ততদিন ঐ আঞ্চলিক রূপগুলিকে বলা হবে উপভাষা (Dialect)''। সাধারণত দেখা যায়, ভাষা একটি বৃহৎ অঞ্চলে প্রচলিত, উপভাষা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অঞ্চলে প্রচলিত।

অঞ্চল ভেদে একই ভাষার মধ্যে পার্থক্য হওয়ার ফলে ভাষার আঞ্চলিক রূপভেদ প্রাচীনকাল থেকেই দেখা যায়। প্রাচীন গ্রীক ভাষায় Attic-Ionic, Arcadian-Cyprian, Aeolic, Doric প্রভৃতি আঞ্চলিক উপভাষা ছিল। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষাতেই আঞ্চলিক পার্থক্য গড়ে উঠেছিল—'উদীচ্য', 'মধ্যদেশীয়' ও 'প্রাচ্য'। পৃথিবীতে সর্বাধিক প্রচলিত ভাষা ইংরেজীর দুই প্রধান রূপ— ব্রিটিশ ও আমেরিকান। জার্মান ভাষায় আঞ্চলিক পার্থক্য খুব বেশী। সুতরাং দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর প্রাচীন ও আধুনিক প্রায় সব ভাষায়ই রয়েছে আঞ্চলিক বৈচিত্র্য— আঞ্চলিক উপভাষা। অস্ট্রিক বংশজাত সাঁওতালি ভাষায়ও এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেনি। সাঁওতালি ভাষার প্রধান দুটি উপভাষা (Dialect) রয়েছে—

১) Southern dialect বা দক্ষিণ সাঁওতালি রূপ।

২) Northern dialect বা উত্তর সাঁওতালি রূপ।

Compbell তাঁর 'Santali - English Dictionary' -তে উল্লেখ করেছেন যে সাঁওতালি ভাষার দুটি উপভাষা (dialect) আছে এবং তাদের নামকরণ করেছেন Southern এবং Northern Diaclects।

যদিও R. N. Cust সাঁওতালি ভাষার চারটি উপভাষার কথা উল্লেখ করেছেন এবং পরে তিনি স্বীকার করেছেন যে এই চারটি উপভাষার সম্ভাব্যতা বাস্তবে নেই। কারণ সাঁওতালি ভাষার এই চারটি উপভাষার অস্তিত্বকে R.N.Cust প্রামাণ্যতা দান করতে পারেন নি এবং এখনো পর্যন্ত তা প্রমানিতও হয় নি। সাঁওতাল মানুষজনেরা বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলেও অধিক পরিমানে বসবাস করে পশ্চিমবঙ্গ এবং ঝাড়খন্ড রাজ্যে। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া জেলা, উড়িষ্যা রাজ্যের ময়ূরভঞ্জ জেলায় ব্যবহৃত সাঁওতালি শব্দ, শব্দের উচ্চারণ, এবং প্রচলিত শব্দের অর্থের সঙ্গে পার্থক্য দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত বীরভূম, বর্ধমান (উত্তর), মূর্শিদাবাদ, মালদা জেলা এবং ঝাড়খন্ড রাজ্যের সাঁওতাল পরগণা অঞ্চলে ব্যবহৃত সাঁওতালি শব্দের উচ্চারণ, ব্যবহৃত শব্দ ও অর্থের মধ্যে। আমি সাঁওতালি ভাষার উপভাষাগত Field Survey করেছি পশ্চিমবঙ্গ , ঝাড়খন্ড রাজ্যের সাঁওতাল পরগণা অঞ্চল এবং উড়িষ্যা রাজ্যের ময়ূরভঞ্জ জেলায়। সাঁওতালি ভাষার মান্য উপভাষা নির্ণয় সম্পর্কিত এই ক্ষেত্র সমীক্ষা থেকে Campbell-র দ্বারা উল্লেখিত সাঁওতালি ভাষার দুটি উপভাষা Southern এবং Norther dialect -এর নিশ্চিত সন্ধান মিলেছে। সাঁওতালি ভাষার দুটি প্রধান উপভাষা ও সেগুলির অবস্থান দেওয়া হল। সাঁওতালি উপভাষা সংক্রান্ত তথ্য তাদের অবস্থান ইত্যাদি আমি সংগ্রহ করেছি ক্ষেত্রগত সমীক্ষা থেকে —

উপভাষা	অবস্থান
Southern dialect বা দক্ষিণ সাঁওতালি রূপ	পশ্চিমবঙ্গ (বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া), উড়িষ্যা (ময়ূরভঞ্জ)
Northern dialect বা উত্তর সাঁওতালি রূপ	পশ্চিমবঙ্গ (বর্ধমান - উত্তর, বীরভূম, মূর্শিদাবাদ, মালদা)
	ঝাড়খন্ড (সাঁওতাল পরগণা)

যেহেতু সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষেরা বিভিন্ন রাজ্যে বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করেন সেহেতু বিভিন্ন অঞ্চলের সাঁওতালি ভাষার রূপতত্ত্ব, ধ্বনিতত্ত্ব ও শব্দভান্ডারের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তাছাড়া বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত প্রাদেশিক ভাষার সংস্পর্শে আসার ফলে সাঁওতালি ভাষার মধ্যেও অনেক শব্দগত পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। যেমন— আসাম ও নেপালের কথা ধরা যাক। আসামে যেমন অসমিয়া ভাষার প্রভাবজনিত কারণে সাঁওতালি শব্দের উচ্চারণ, শব্দগত অর্থ এবং কিছু কিছু সাঁওতালি শব্দও পরিবর্তিত হয়ে গেছে, তেমনি নেপালেও নেপালী ভাষার প্রভাবজনিত কারণে সেখানে প্রচলিত সাঁওতালি

শব্দগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এইভাবে সাঁওতালি উপভাষাজনিত সমস্যা ক্রমশ জটিল আকার ধারণ করছে। কারণ এখনো পর্যন্ত সাঁওতালি মান্য উপভাষা কোনটি সে সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয় নি। কিছু উচ্চারণের সাহায্যে বিষয়টি বোঝানো যেতে পারে। যেমন—

আতো (N)	—	আতু (S) (গ্রাম)
দারে (N)	—	দারি (S) (গাছ)
হাকো (N)	—	হাকু (S) (মাছ)
সেরেএ((N)	—	সিরিএ((S) (গান)
আয়ো (N)	—	আয়ু (S) (মা)
বেলে (N)	—	বিলি (S) (ডিম)
ওনা (N)	—	অনা (S) (ঐটা)
ওকা (N)	—	অকা (S) (কি)

এই ধরনের অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। এখন প্রশ্ন হল কোন্ রূপটি মান্য সাঁওতালি হিসাবে বিবেচনা যোগ্য? আবার বাংলায় 'তুমি' সাঁওতালিতে 'আম', 'আপনি' অর্থে সাঁওতালিতে 'আবিন/আবেন' শব্দের ব্যবহার করেন। আবার 'আবিন/আবেন' শব্দ বিশেষ সম্পর্কের আত্মীয়দের মধ্যে ব্যবহৃত হয়। এইভাবে সাঁওতালি ভাষার নির্দিষ্ট Standard মানে অন্তরায় সৃষ্টি হচ্ছে। Northern region -এর সাঁওতাল মানুষজনেরা Southern region -এর উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য কোনমতেই গ্রহণ করতে সম্মত নয় এবং একইভাবে Southern region -এর সাঁওতালরাও তাদের নিজস্ব উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যকেই ধরে রাখার পক্ষপাতী। সুতরাং সাঁওতালি ভাষার মান্যরূপ নির্ধারণ করাটা খুবই জরুরী ও প্রাসঙ্গিক একটি প্রসঙ্গ।

এর ফলস্বরূপ বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিভিন্ন রাজ্য থেকে, যে সমস্ত সাঁওতালি পুস্তক, পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে সেগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সেগুলিতে ব্যবহৃত শব্দ ও উচ্চারণ মোটেই এক ধরণের নয়। ফলে সাঁওতালি লিখিত সাহিত্যের মধ্যে ভাষার সংহতি ও গুণমান নিয়ে সাঁওতাল সাহিত্যিকরা দ্বিধার মধ্যে আছেন। এই দিক থেকে পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায় যে সাঁওতালি ভাষার মান্যীকরণ কতটা প্রাসঙ্গিক বিষয়। কারণ সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে এই প্রকার শব্দ বা বাক্য গঠনের শৈলী ব্যবহার করা প্রয়োজন।

এই প্রসঙ্গে আরো একটি উল্লেখ্য বিষয় হল, সাঁওতালি ভাষার জীবন্ত সমস্যা হল

লিপি সমস্যা। কারণ কোন ভাষার মান্যীকরণ করতে হলে প্রথমেই দেখা দরকার যে সেই ভাষার মান্যলিপি আছে কিনা। সাঁওতালি ভাষার ট্রাজেডি এই যে, প্রায় পাঁচটি লিপির দ্বারা বিচ্ছিন্ন এই ভাষাগোষ্ঠী। বিহার ও ঝাড়খন্ডে সাঁওতালি চর্চা হয় রোমান ও দেবনাগরী লিপিতে, বাংলায় বাংলা ও অলচিকি লিপিতে, উড়িষ্যায় ওড়িয়া ও অলচিকিতে, আসামে অসমিয়া ও অলচিকি লিপিতে লেখা হয় সাঁওতালি ভাষা। ফলে নানা প্রান্তের সাঁওতাল রাজনৈতিক কারণে প্রাদেশিক সরকার একাধিক লিপিকে পৃষ্ঠপোষকতা করেন, এর ফলে যে বাস্তব সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে তা হল বিভিন্ন প্রান্তের সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে, ভাবের আদান প্রদান হচ্ছে না।

বর্তমানে বর্ধমান ও বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ অনেক কলেজে সাঁওতালিতে স্নাতক স্তরের পাঠক্রম চালু হয়েছে। ফলে সাঁওতালি শিক্ষার্থীরা বুঝে উঠতে পারছে না যে কোন শব্দ বা কোন লিপি তারা ব্যবহার করবে। মান্য শব্দ বা মান্য লিপি নিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংশয় দেখা দিচ্ছে। এইভাবে সাঁওতালি লিখিত সাহিত্যের মধ্যে ব্যবহারিক সংকট সৃষ্টি হচ্ছে। শব্দগত, উচ্চারণগত প্রভেদের জন্য সাঁওতালি ভাষার সমন্বয় সম্ভব হয়নি। ফলে সাহিত্যের ভাষাও গড়ে ওঠে নি।

এই সমস্যার সমাধান হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। বিশেষ করে লিখিত সাহিত্যের জন্য প্রয়োজন মান্য লিপি ও মান্য ভাষার। কারণ ভাষাগত সংহতি বজায় না থাকলে লিখিত সাহিত্যের গুণমান নিয়ে সংশয় থেকে যায়। সুতরাং সাঁওতালি ভাষার মান্যীকরণ হলে সমগ্র সাঁওতাল সমাজ উপকৃত হবে। শুধু শিক্ষার্থীরাই নয়, সাঁওতাল লেখকগণ, পত্র-পত্রিকার সম্পাদকগণ থেকে শুরু করে সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও সাঁওতালি ভাষার মান্যীকরণ অত্যন্ত প্রয়োজন। তাছাড়া সাঁওতালি লিখিত রূপ থেকে কথ্য সাঁওতালি ভাষাতেও মান্যরূপের প্রভাব পড়বে। যেমন - বাংলা ভাষায় হয়েছে। সব থেকে বড়ো কথা হল, সাঁওতালি ভাষার মান্যীকরণ হলে বিভিন্ন প্রান্তের সাঁওতাল গোষ্ঠীর মধ্যে ভাষাকেন্দ্রিক বিরোধ মিটে যাবে, তারা সকলেই ঐক্যবদ্ধ হবার সুযোগ পারে, উন্মোচিত হবে সাঁওতালি ভাষা জগতে একটা নতুন দিগন্তের।

(লেখিকা - অধ্যাপিকা, বাঁকুড়া জিলা সারদামনি মহিলা মহাবিদ্যাপীঠ, বাঁকুড়া)

তুষার রায়

কথায় কথায়

সময়টা মন্দ। বেশ মন্দ, জটিল রাজ্যবাসীর কাছে। বিতৃষ(া, বিরক্তি, আতঙ্ক, আশঙ্কায় যেন আছন্ন অনেকেই। অনেকে আবার এসবে ততটা আক্রান্ত নয়, চিন্তিত। চিন্তা-ভাবনা তো থাকবেই। ভাবনা আছে, গভীর ব্যাপক। ভাবনা তাদেরই যারা দেশের মানুষকে নিয়ে ভাবে। দেশকে নিয়ে ভাবে। ভাবতে ভালোবাসে দেশের অবিরল অগ্রগতির কথা। জীবনের নতুন দিগন্তে পা ফেলার কথা। নতুন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা। থাকবে না শোষন নিপীড়ন। মানুষে মানুষে বৈষম্য বিভেদ। সৃজনশীল সহনশীল সমাজ — সুন্দর স্বচ্ছন্দ সাবলীল। মানুষে মানুষে সাম্য সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নেয়া হবে দৃঢ় পদক্ষেপ। দেশের মাটিতে সবার সমান স্বত্ব প্রতিষ্ঠার সংকল্প। মানুষের মনুষ্যত্ব, সার্বিক মূল্যবোধ পাবে মুক্তির স্বাদ। ঘটবে মানব সভ্যতার নতুন স্তরে উত্তরণ। শোষক-শোষিত, ধনী-নির্ধন, শ্রমিক-মালিক, তথাকথিত বুদ্ধিজীবী-শ্রমজীবী, এমন কী, 'মৃত্যু এবং জীবন, শক্তি এবং প্রেম, স্বার্থ এবং কল্যাণ — এই যে বিপরীতে বিরোধ'(রবীন্দ্রনাথ) অর্থাৎ চলতি সমাজব্যবস্থার গভীরে নিহিত অন্তর্লীন যে দ্বন্দ্ব দিনে দিনে, দীর্ঘ অপেক্ষায় অনুশীলনে এবং নিরন্তর সংগ্রামে অবসান ঘটবে তার। ভাবনার 'ভাবের স্বতঃ ক্রিয়াশীলতা যা স্থিতি ও প্রতিস্থিতির সৃষ্টি করে, এ দুয়ের পারস্পরিক বিরোধের বিলোপ করে উন্নতর সমন্বিত স্থিতিতে উন্নীত হয়।' প্রতিস্থিতি(অ্যান্টিথিসিস) ভিন্ন প্রগতি সম্ভব নয় এবং সভ্যতা এই নিয়মেই অগ্রসরমান। দ্বন্দ্বের নিরসনে বা নতুন স্তরে রূপান্তরে সূচিত হয় গুণগত পরিবর্তন। বৈপ-বিক মৌলিক জনস্বার্থবাহী কল্যাণ। নিতান্ত অভাবী অনাহারী স্বাস্থ্য শিক্ষা আশ্রয়ের অভাবে যারা নির্যাতিত নিপীড়িত অবহেলিত তাদের সামনে উন্মুক্ত হবে মনুষ্যজীবনের সার্থকতার মুক্তধারা। আবহমানকাল — প্রবাহী স্রোতস্বতী। জীবনে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার যুগ যুগ অনাস্বাদিত স্বাদ সার্থকতা। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক জীবন, সামাজিক ঘটনা ও সামাজিক ইতিহাস অধ্যয়ন ও চর্চা অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক দর্শনের আলোয় শ্রেণিবিভক্ত সমাজের উদ্ভুত সমস্যাবলী বিচার ও সমাধানের পথে এগোলে এর ফল হয় ব্যাপক এবং সুদূর প্রসারী, শুধুমাত্র বৈষয়িক সমৃদ্ধিতেই সীমাবদ্ধ থাকে না। সাম্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আপামর জনসাধারনের মুক্ত এবং অবাধ অর্থাৎ স্বাধীন বিচরণ মননচিন্তনে সৃজনধর্মী বৈচিত্র আনে, আলোকিত করে উর্বর করে সুসংস্কৃত মানসজগৎ। নতুন সৃষ্টির মন্দাকিনী প্রবাহ। কারণ 'ন্যায় বিচার ও স্বাধীনতাই হচ্ছে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্প ও সাহিত্যের উৎস' (রবীন্দ্রনাথ)। শ্রেণিবিভক্ত সমাজে তথাকথিত বুর্জোয়া গণতন্ত্রে বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষের জন্য ন্যায়বিচার বা স্বাধীনতা কোথায়! স্বাধীনতা খোঁটায় বাঁধা জন্তুর দড়ির দৈর্ঘ-পরিমান মাত্র। নতুন সৃষ্টির দ্বার সম্ভাবনা তাই রুদ্ধ আবদ্ধ শৃঙ্খলিত।

সময়টা মন্দ জটিল বিভ্রান্তিকর অবশ্যই রাজ্য রাজনীতির প্রশ্নে। বিতৃষ(া বিরক্তি আতঙ্ক আশঙ্কায় আক্রান্ত সহজ সরল অসংগঠিত মানুষেরই একাংশ। সমাজ পরিবর্তনের প্রশ্নে ধ্রুপদী পথে পরিক্রমণ অব্যাহত রেখে যে সৃজনশীল এবং আপাত ব্যতিক্রমী পথে পথচলার সর্বোতপ্রয়াস চলছে এবং সে পথচলা যে রাজ্যে সকল স্তরের মানুষের কল্যাণে উন্নয়নে সামগ্রিক অগ্রগতির লক্ষ্যে নির্দেশিত তার সম্যক উপলব্ধির অভাব দেখ যাচ্ছে। একদিকে এর কারণ লক্ষ্য করা যায়

শ্রেণিচেতনার নিদারুণ অভাবে ঘাটতিতে। দেশের জনসংখ্যার যে সাতাত্তর ভাগ মানুষ চরম দারিদ্রে নির্বাসিত নিক্ষে পিত (শ্রী অর্জুন সেনগুপ্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে — কেন্দ্রীয় সরকারি কমিটির রিপোর্ট)। দৈনিক আয় যাদের কুড়ি টাকারও নীচে, তারা দুর্ভাগ্যক্রমে নিজেদের অবস্থান অর্থাৎ শ্রেণি-সম্পর্কে সমাজের কাছে তাদের ন্যায্য পাওনা বিষয়ে আত্মসচেতন নয়। সচেতনার অর্থ যে ক্রিয়াশীলতা এবং এই শ্রেণিচেতনার, ক্রিয়াশীলতার জন্য ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া জড়িত সমগ্র সমাজ যে নতুন নতুন রূপ ধারণ করে যেমন, দাস-সামন্ত-বুর্জোয়া বা পুঁজিপতি — সে সম্পর্কে মোটেই অবহিত নয়। অর্থাৎ সমাজব্যবস্থার অনিবার্য পরিবর্তন সম্পর্কেই অজ্ঞ উদাসীন। আর রাজনৈতিক দল যাদের ইতিহাস নির্দ্ধারিত কর্তব্য শোষিত নির্যাতিত মানুষদের শ্রেণিচেতনায় সমৃদ্ধ করে শিক্ষি ত আত্মসচেতন কোরে তোলা সে কাজও দুর্ভাগ্যক্রমে অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। কমিউনিস্টদের যে অত্যাবশকীয় বৈশিষ্ট থাকা দরকার— 'courage, character and intelligence' সেটা অনেকাংশেই অনুপস্থিত লক্ষ্য করা যায়। বিভ্রান্তি তাই অনেকটাই অন্তর্ঘাতী। ভ্রমে বিভ্রমে। অজ্ঞতায় বা শৈথিল্যে। অথবা হতে পারে স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়কার উদার জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়া দলগুলির নিবিড় ঘনিষ্টতাজনিত প্রভাব কমিউনিস্ট পার্টি সহ বামপন্থী দলগুলির ওপর। জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে যে প্ল্যাটফর্ম তৈরি হয়েছিল তার চন্দ্রাতপের স্নিগ্ধতা কোমলতা আয়াস। অথবা হতে পারে হতে পারে ওই পার্টিগুলিতে সচ্ছল দ্বিধান্বিত কল্পনাবিলাসী মধ্যবিত্ত বিশেষ করে উচ্চমধ্যবিত্ত চলতি সমাজে প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তিত্তের নিরঙ্কুশ প্রাদুর্ভাব প্রভাব। ফলে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি অঢেল মমত্ব স্নেহ, দক্ষ সাংসদ বিবেচনায় তৃপ্তিজনক প্রাপ্তি-প্রশস্তি পুরস্কার। রাজনীতির পাঠ থেকে declassed শব্দটাই সম্পূর্ণ deleted. সর্বহারার মানসিকতায় ত্যাগী ইস্পাতদৃঢ় চরিত্র বৈশিষ্ট কোথায়! এটাই মার্কসের কথায় সাচ্চা সাম্যবাদী কর্মী হওয়ার পূর্বসর্ত। যখন উনি বলেন, 'By acting on the external world and changing it, man changes his own nature' ইতিহাসে মানুষ সেইজন্য মানুষ ধ্রুবক নয়, পরিবর্তনশীল।— 'All history is the progressive modification of human nature.'

'স্বাস্থ্যবান', ধনী একশ্রেণি মানুষের সঙ্গে বুভুক্ষু, রুগ্ন, ক্লিষ্ট আর এক শ্রেণির মানুষের মধ্যে যে মূর্ত পার্থক্য এই কঠিন সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। যেমন 'শব্দের থেকে গান জাগছে, রেখার থেকে রূপের অরূপতা'(রবীন্দ্রনাথ)। মনে রাখতে হবে মার্কসের কথা — 'educator must himself be educated',আরো মনে রাখতে হবে এই সত্য এই শিক্ষা, যে পরীক্ষাই আমরা করিনা কেন, শোষনমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থায় অগণিত শোষিতের মুক্তি, দেশের মা-রূপের উদ্ভাস পরিণামে চূড়ান্ত বিচ্ছেদেই অর্থাৎ বিপ-বেই (alienation) সম্ভব। রবীন্দ্রনাথের কথায় 'মায়ের গর্ভের মধ্যে মাকে পাওয়া যেমন মাকে পাওয়াই নয়। তাঁকে বিচ্ছেদের মধ্যে পাওয়াই পাওয়া।' আশা-আকাঙক্ষায় বেড়ে উঠার জাজ্জ্বল্যমান প্রেরণা। রাষ্ট্রের অনুরূপই।

অপরদিকে এই আতঙ্ক, উদ্বেগ, বিতৃষ(া, বিরক্তির যে আবহ তৈরি হয়েছে এই রাজ্যে এই মূলে নিদারুণ দায়িত্বজ্ঞানহীন, আদর্শহীন এবং নেহাতই সুযোগসন্ধানী অপরিনামদর্শী বিরোধীদল, গোষ্ঠী এবং কিছু নিজস্ব পেশাগত জীবনে বিশিষ্টতা লাভে সমর্থ, 'larger than large' তথাকথিত সেলিব্রেটি।

প্রধান বিরোধি দলটির অবয়বটি ছোটই। দোষের কী! বামনও তো বিষ্ণুর পঞ্চম অবতার।

প্রায় তিনশত বিধায়কের বিধানসভায় কাটায় কাটায় তিরিশ। কীভাবেই বা হবে। ভোট তো স্বতঃস্ফূর্ততায় সুস্থ বিচারবিবেচনায় কোন আদর্শের প্রতি আনুগত্যে আসে না। আসে জোরজবরদস্তি এলাকাদখলে, নির্জলা মিথ্যার পসরা বিছিয়ে আর মতলববাজ বাজারি বৈদ্যুতিন সংবাদ মাধ্যমের প্রশ্রয়ে প্ররোচনায়, নির্বাচনী 'সোপ অপেরা' বা সট স্টোরির' ডালায় করে। আর কিছু আসে কোন না কোন বিষয়ে শাসকদলের প্রতি জমাট বিরক্তি রূপে। অর্থাৎ নানা তুচ্ছ বিষয়ে বিরক্তির 'মেটাস্ট্যাটিক' ফর্ম। প্রধান বিরোধী দলটিও সুস্থ বিকল্প রাজনৈতিক আদর্শ সামনে রেখে জন্মায়নি। জন্মঘর ভেঙে ঘর, দল ভেঙে দল। ব্যক্তিত্বর ঠেলাঠেলি, পদাধিকার নিয়ে কাড়াকাড়ি, মাতব্বরির ঠোকাঠোকি ঘর্ষণ ফুলকি। 'অগ্নিকন্যার' ভূমিষ্ট হওয়া। ছয় এবং সাতের দশকে কংগ্রেসের যেসব দাগী দুস্কৃতী লুম্পেন ওদের ছাত্রযুব শাখায় গিজগিজ করত এবং সাতের দশকে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের আমলে পুলিসের সাহায্যে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ কে — প্রথমে নকশালপন্থী-অতিবামপন্থী-তরুণদের, পরবর্তী সময়ে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট কর্মীদের নির্বিচার নিহিংসনের অভিচারে মত্ত হয়ে উঠেছিল, তাদেরই অগ্রাধিকার দিয়ে দল গঠন। সেই কালো দিনগুলিতে নৃশংসভাবে বিনাবিচারে হত্যা করা হয়েছিল প্রায় বারো হাজার তরুণ বিপ-বীকে। তাদের মধ্যে অধিকাংশই নামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কৃতী মেধাবী ছাত্র অধ্যাপক ইনজিনিয়ার বা সর্বক্ষ ণের রাজনৈতিক কর্মী। এর মধ্যে আমার আপিসের তরুণ সহকর্মী ছিল একসময়ের প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র অজয় সান্যাল, অন্যজন প্রতীপ ঘোষ। বাংলার একটা জেনারশনের মেধা সাহস জ্বলন্ত দেশপ্রেম যেন চলে গেল। বরানগর, বারাসাত,বেলেঘাটা, টালিগঞ্জ, ভবানীদত্ত লেন আরো কত মারণভূমির কথা কে ভুলতে পারে! কে ভুলতে পারে প্রখ্যাত কবি, সাংবাদিক, সাহিত্যিক সরোজ দত্তকে লিকুইডেট (liquidate) করে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার কথা। কেই বা ভুলতে পারে জননায়ক হেমন্ত বসুর হাড় হিম হয়ে যাওয়া হত্যার কথা। এই ভয়ংকর ক্রিয়াকলাপের উত্তরাধিকারী এই বিরোধী দল এবং অনেক গোষ্ঠি। আগাগোড়া একটি আনঅ্যালায়েড (unalloyed) ফ্যাসিস্ট ফরমেসন। নেত্রী তো নয় উদবেজয়িত্রী। উদবেগ, আতঙ্ক, আশঙ্কার আকর। কথায় কথায় বনধ্, অবরোধ, থানায় তালা, আপিসে তালা, সরকারি কর্মী অফিসারদের অশ্রাব্য ভাষায় গালিগলাজ, বিধানসভায় মূল্যবান আসবাবপত্র ভাঙচুড়, দাগীদুস্কৃতীদের ছাড়াতে থানা আক্রমণ, প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক কর্মীসমর্থকদের খুন, জ্যান্ত পোড়ান (নন্দীগ্রামের শঙ্কর সামন্ত, পুরুলিয়ায় রবীন্দ্রনাথ কর ও তার স্ত্রী) কী না নারকীয় তান্ডব করে যাচ্ছে ওই বিরোধী দল ও কয়েকটি গোষ্ঠী। একটা sadist approach! সাধারণের মনে ভয়ভীতির সঞ্চার করে নৈরাজ্যের সৃষ্টি করা। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ধারে কাছেও নেই। শুধুই পেশী শক্তির আস্ফলন। বলার ঢং অতিনাটকীয়। অ্যাপোক্যালিপটিক। রহস্যময়। সত্যমিথ্যার তোয়াক্কা নেই। রাজনৈতিক ক্ষ মতালোলুপতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে সেটা যেনতেন প্রকারে হাসিল হলেই হল। বিবেকের বালাই নেই। সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলির সঙ্গে সুবিধাবাদী জোট বেঁধে দেশের সামগ্রিক স্বার্থের বিরুদ্ধে সর্বনাশা অপরিনামদর্শী কাজ করে যাচ্ছে। হয় কোনও ব্যক্তিগত বা অকিঞ্চিৎকর বিষয়ে সাম্প্রদায়িক ভাবাবেগকে কাজে লাগিয়ে বাজার গরম করার ফন্দি এঁটে বেড়ায়। না হয় নিজের দলীয় বা ব্যক্তিগত স্বার্থে চরম সুবিধাবাদী সুযোগসন্ধানী — পথ ধরেই চলে। সমসাময়িক জরুরী বিষয় কী কাশ্মীর, কী গোর্খাল্যান্ড, এমন কী সন্ত্রাসবাদীদের সম্পর্কেও একটি বাক্য ব্যয় করতে শোনা যায় না। না কোনো উল্লেখ বিশ্বায়ন বা পুঁজিবাদের ভরা

ডুবি সম্পর্কে। এরকম একটি ভয়ংকর বিধ্বংসী শক্তিকেই যে বেছে নেবে শোষক শ্রেণি, কায়েমী স্বার্থ, কী দেশি কী বিদেশি, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। অবাক হতে হয় কী মহৎ উদ্দেশে বা কাদের স্বার্থেই মার্কিন-বৃটিশ কুটনৈতিক প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎ ঘনিষ্ঠতা একেবারে সরজমিনে কালীঘাটের গলিতে হাজির হয়! বুঝতে অসুবিধা হবে না কারোর পশ্চিমবঙ্গের অভ্যন্তরীন রাজনীতিতে ওদের আগ্রহ কীসে এবং কেন। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা আজ সমূহ বিপর্যের গহ্বরে। পুঁজিবাদী আর্থিক কাঠামো তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ছে। একের পর এক কলকারখানা তালাবন্ধ। লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কর্মচ্যুত। গত একবছর শুধু আমেরিকাতেই ২১ লক্ষ শ্রমিক কাজ হারিয়েছে। আমদানী রপ্তানী তথা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মাঝ দরিয়ায় স্থির স্তব্ধ। সরকারি কোষাগার থেকে কোটি কোটি লক্ষ ডলার ইউরো এসব তোলা দিয়েও শেষরক্ষা হচ্ছে না। ঐসব দেশে অর্থনৈতিক বিপর্যয় স্থায়ী হলে, রাজনৈতিক বিপর্যয়ও বেশি দূরের বিষয় নয়। কিউবার পর দক্ষিণ আমেরিকায় জনস্বার্থবাহী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হচ্ছে একের পর এক। আর আমেরিকা নির্ভর অর্থনীতি নয়, স্বাধীন অর্থনীতি বহুদেশিয় ব্যাঙ্ক গড়ে তুলছে। আশঙ্কিত হয়ে পড়ছে ধুরন্ধর সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। ওরা হন্যে হয়ে খুঁজে ফিরছে বাজার। খুঁজে বেড়াচ্ছে তাঁবেদার রাজনৈতিক শক্তি। ইরাক, আফগানিস্তানের পর আরো দেশ। কাছাকাছি টানছে ভারতকে। একশ কোটির বাজার, শস্তা শ্রম। তাই যোগাযোগ খড়কুটো ধরেও, মস্তিস্কহীন নৈরাজ্য সৃষ্টিতে এবং নৃশংসতার potentiality আছে কিনা। ওদের বাজপাখির চোখ। এককালে প্রায় সারা পৃথিবীকে পদানত রাখতে পেরেছিল বিশ্বাসঘাতক বেইমানদের দৌলতে। কাজেই ওই চরিত্রকেই ওদের চাই। নৃশংস নির্মম বিশৃঙ্খলাকারীদের। যেমন পেয়েছিল ওসামা বিন লাদেন, তালিবানদের আফগানিস্তানের সাধারণ মানুষের সরকাকে উৎখাত করতে। এই তালিবানেরাই আমেরিকা পাকিস্তানের প্রত্যক্ষ প্ররোচনায় ঐ দেশের প্রেসিডেন্টকে হত্যা করে রাস্তায় ঝুলিয়ে রেখেছিল। ওরা সাম্রাজ্যবাদীরা লক্ষ রেখেছে বিশৃঙ্খলায় সিদ্ধহস্ত পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী শক্তিগুলির ওপর। আদর্শহীন ক্ষমতা লোভীদের ওপর ভরসা রাখতেই পারে। দেখেছে ওরা কীভাবে বিরোধী গোষ্ঠীর 'স্টর্মট্রুপাররা' সশস্ত্র হামলা করে নন্দীগ্রাম কী সিঙ্গুর কী অন্যত্র সরকারের উন্নয়ন প্রকল্পগুলিকে ব্যাহত বানচাল করতে বদ্ধপরিকর। কী ঘৃণ্য নারকীয় উপায় খুন করতে পারে ওরা। জ্যান্ত পুড়িয়ে মারতে পারে। কীভাবে গায়ে বোমা বেঁধে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে হত্যা করতে পারে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ কে। উৎখাত করতে পারে হাজার হাজার রাজনৈতিক কর্মী সমর্থকদের। এই নির্মম শক্তিকেই তো সাম্রাজ্যবাদীদের চাই শোষনমূলক ব্যবস্থাকে কায়েম রাখতে। দুনিয়াজোড়া প্রভুত্বকে স্থায়ী ও বিকৃত করতে। সংখ্যাটা ওদের কাছে বড় প্রশ্ন নয়। বিবেকবর্জিত মস্তিস্কহীন পাশবিক প্রবৃত্তিটাই ওদের কাছে বড় অস্ত্রশালা। একটা দুটো মারণাস্ত্র থেকে বিবেকহীন হিংস্র মানববোমাই বা কম কীসে।

আমাদের তীক্ষন দৃষ্টি দিয়ে দিয়ে দেখতে হবে পশ্চিমবঙ্গের এত সমস্যা এত হিংসা হিংস্রতা সংঘটিত হচ্ছে কেন। বেছে বেছে গুনে গুনে রাজনৈতিক কর্মীদের খুন করা হচ্ছে।কেনই বা কোন কোন অছিলায় শিল্পায়ন সহ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প রূপায়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা প্রতিরোধ সৃষ্টি করা হচ্ছে। এর একমাত্র কারণ ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মানচিত্রে পশ্চিমবাংলা, কেরল, ত্রিপুরার অবস্থান গুণগতভাবে অন্যান্য রাজ্য থেকে বিশিষ্টতার দাবি রাখে। প্রশাসন থেকে উন্নয়ন পরিকল্পনা, রচনা থেকে রূপায়ন সব বিষয়েই এই তিনটি রাজ্য দেশে কেন, বিদেশেও নতুন পথের পথিকৃৎ।

বিকল্প পথে পরিক্রমার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকাঠামোয় সংসদীয় গণতন্ত্রে তিনটি অঙ্গ রাজ্যে নির্বচনে বিপুল জনসমর্থন নিয়ে সরকার গঠন ও দীর্ঘ তিনদশক ক্রমবর্ধমান শক্তি নিয়ে টিঁকে থাকা নিঃসন্দেহে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এক গভীর তাৎপর্যপূর্ণ বিরল ঘটনা। এই ত্রয়ীর মধ্যেও পশ্চিমবাংলা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষন করে নানা অর্থপূর্ণ কারণে। কলকাতা ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের পীঠস্থান। বিশ্বের বুদ্ধিজীবীদের যে কয়টি কেন্দ্রস্থল আছে যেখানে শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির নব নব উন্মেষ সম্ভব হচ্ছে অবিরল তারমধ্যে কলকাতা অন্যতম। এই বিদ্বজনদের বিপুল সমর্থন, এই বিশিষ্ট বিরল প্রতিভার মানুষদের গ্রহন যোগ্যতা নিয়েই দীর্ঘ তিনদশক ধরে সফল সার্থকভাবে কাজ করে যাচ্ছে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে বামফ্রন্ট সরকার। স্বাভাবিক কারণেই বিণ্মিত হয় আতঙ্কিত হয় দেশি বিদেশি শোষনবাদী কায়েমীস্বার্থ। কৌতুহলের সীমা নেই ওদের। সবচেয়ে আচানক তাকলাগানো, বিনা রক্তপাতে মৌলিক ভূমিসংস্কার, গরীব কৃষকদের মধ্যে ভূমিবন্টন। জোতদারদের উদ্বৃত্ত জমি খাস করে চাষ ও গৃহনির্মানের জন্য ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণ। ফলে উৎপাদন শক্তির আশাতীত বৃদ্ধি। আট কোটি জনসংখ্যার রাজ্য যেটি একসময় ছিল খাদ্যে ঘাটতি, পরমুখাপেক্ষী, সেই রাজ্য আজ খাদ্যে উদ্বৃত্ত। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রযুক্তি, বিদ্যুত, স্বনিযুক্তি প্রকল্পের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ লোকের বিশেষ করে মহিলাদের স্বনির্ভর স্বাবলম্বী করার উদ্যোগ, পর্যটন, রাস্তাঘাট, পরিবহন সহ আরো অনেক বিষয়েই জনস্বার্থ অভিমূখীন কর্মসূচি গ্রহন ও রূপায়ন চলছে পুরোদমে। সব কিছুই নানা দ্বন্দ্বের মুখোমুখি হয়ে দ্বন্দ্ব নিরসন করে। প্রতিবন্ধকতা দ্বন্দ্ব প্রবল, চিরাচরিত ঐতিহ্যবাহিত সামন্তবাদ ও পুঁজিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী, জীবনাচরণ আঁকড়ে, থাকার প্রশ্নে। বুর্জোয়া রাষ্ট্র ও সমাজ নিস্যন্দিত প্রতিকূল প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া কঠিন, সময়সাপেক্ষ। এমনকী বুর্জোয়া রাষ্ট্রের অবসান বা বিলুপ্তি ঘটিয়েও পুরনো ধ্যানধারণা যেমন অন্ধ ধর্মবিশ্বাস, নানা কুসংস্কার, ব্যক্তিগত স্বার্থর অস্মিতা acquisitiveness (মাও) এসব অহিতকর অবক্ষয়ী জীবনাচরন থেকে অব্যাহতি দুর্লভ নাহলেও দুস্কর। এরজন্য প্রয়োজন ব্যপক শিক্ষার প্রসার, বিজ্ঞানমনস্কতা, আত্মানুশীলন, অধ্যাবসায়। সমগ্রতার স্বার্থে ত্যাগস্বীকারে উদ্বুদ্ধ করা। রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের দৃষ্টান্ত স্বরূপ কাজ, জীবনধারা। তবে অবশ্যই এ সমস্যা মৌলিক। শিকড়ের সমস্যা। মানবজাতির আদিমতম সঙ্গী। অলীক হলেও অস্তিত্তের সঙ্গে জড়িত বলে অন্ধ বিশ্বাস।

শিল্পায়নের প্রশ্নে যে আলোড়ন, যে উতল হাওয়া উঠেছে এর পিছনেও উপরোক্ত পশ্চাৎমুখী ধ্যান-ধারনা, আত্মসর্বস্বতা কাজ করছে। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের অযৌক্তিক বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মতলবী আস্ফলনের কথা বাদ দিলেও শিল্পের জন্য জমি অধিগ্রহনের যে সমস্যা দেখা দিয়েছে সেটা শুধুমাত্র মনগড়া বা বিরুদ্ধ প্রচারের কুফল, প্ররোচনা বলে উড়িয়ে দেয়া ঠিক হবে না। প্রকৃত চাষি যারা জমির মালিক, চলতি সমাজব্যবস্থায় তাদের নিরাপত্তার অভাববোধ কাজ করছে। দৈনন্দিন অভাব অনটন সত্ত্বেও নিজের সন্তান কয়টিকে নিয়ে, বুকে আঁকড়ে, সবুজ জমির টুকরোটাকেই অজানা, অনাগত ভবিষ্যতের বীমা বলে ভাবছে। তাই দ্বন্দ্ব। ব্যক্তিকেন্দ্রিক ভাবনা নিরাপত্তার অভাববোধ, অন্যদিকে অপরিচিত অনাস্বাদিত জীবনজীবিকার প্রতিশ্রুতি। শ্রেণি বৈষম্যমূলক, শোষনমূলক আর্থিক ব্যবস্থায় সম্ভাব্য জীবিকার যে অনুদ্ভিন্ন চেহারা তার সম্যক উপলব্ধি তাদের স্বাভাবিক কারণেই নেই। প্রয়োজনীয় শিক্ষার অভাবে চেতনার ঘাটতি, ফলশ্রুতি দূরদৃষ্টির অভাব। চলাফেরা পদক্ষেপে তাই গড্ডালিকা প্রবাহের ছায়া অথবা হাতের কাছে কাঁচা

টাকার অফার, তথাকথিত প্যাকেজ। সচেতন গ্রহন-বর্জন, কতটুকু চাষিদের পক্ষে সম্ভব খতিয়ে দেখা অবশ্যই দরাকার উদ্ভূত দ্বন্দ্ব যখন সংঘর্ষের পর্যায়ে পরিণত। দোষ দিয়ে লাভ নেই তাদের। ক্ষোভ পোষন করেও। বুর্জোয়া সমাজের স্বরূপ চাষিদের হাড়ে হাড়ে জানা। গ্রামে গ্রামে আজও মহাজন ফড়িয়ার বিভীষিকা। সম্পত্তি ফসল হাতিয়ে নেয়ার ফন্দিফিকির। আর বহুদিন লালিত ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে কেন্দ্র করে acquisitiveness (Mao) (আত্মসাৎ বা আত্মসর্বস্বতা)-এর লক্লকে লিপ্সা। এসব থেকে কী মুক্ত কেউ! তাই সরকারের পরিকল্পিত ও ঘোষিত একান্তই নতুন জীবনযাত্রায় পা বাড়াতে দ্বিধা আশঙ্কা বিরোধীতা। বিশেষ করে যখন এখনও অনেকের কাছে কৃষি অনেকটাই লাভজনক, প্রান্তিক হলেও পারিবারিক সঙ্কটে শেষ সম্বল। পাশাপাশি এটাও চাষিদের দৃষ্টি এড়ায়না যে, যেকেহ, একটু সঙ্গতি হলেই জমিবাড়িতেই টাকা খাটায় সবাই। গ্রামে চাষের জমি, শহরে বাড়ি-ফ্ল্যাট। কলকাতা শহর, সল্টলেক তো অর্ধেকের বেশি বিক্রি হয়ে গেছে কালো ফিকে সব টাকার ব্যবসায়ী দেশি-বিদেশিদের কাছে। চোখের সামনে জমিবাড়িতে এত বিনিয়োগ চাষিদেরও জমি ধরে রাখতে স্বাভাবিক কারণেই উৎসাহিত করে। আমাদের সমাজে ব্যক্তিহিসাবে বদলোক হওয়া, সম্পত্তির মালিক হওয়া এমন কী রাজনৈতিক নেতা কর্মীরাও ব্যতিক্রম নয়। জ্বলন্ত সাক্ষী সল্টলেকের বিলিবন্দবস্ত। এই বাস্তবতায় সমগ্রতার স্বার্থে সমষ্টি উন্নয়নের স্বার্থে ত্যাগস্বীকার করানো কঠিন কাজ। এই দ্বন্দ্ব নিরসনে, সমন্বিত স্থিতিতে পৌঁছতে মানুষের কাছে যেতে হবে, বুঝতে হবে তাদের, বোঝাতে হবে। তাদের কথা শুনতে হবে, দেশের স্বার্থে যে বিকল্প জীবিকা তার নিশ্চয়তা সন্দেহাতীত ভাবে আস্বস্ত করতে হবে। দ্বন্দ্ব বা বিরোধ দূর করার প্রক্রিয়াটা হবে 'from the masses to the masses'. সরকারি Flat বা দলীয় হুকুম বা নির্দেশ 'Commandism' সচেনভাবে এড়িয়ে যেতে হবে। মনে রাখতে হবে আমাদের রাজ্য একটি অঙ্গরাজ্য, সার্বভৌম রাষ্ট্র নয়। আমরা যে নির্বাচিত হই নির্বাচককেদর মধ্যে অনেকেই আছেন যারা আমাদের রাজনৈতিক আদর্শের সঙ্গে সহমত নয়। বিশেষ বিশেষ ইস্যু নিয়ে সহমত দিয়ে যায়। বড়জোড় পঞ্চাশ ভাগের সমর্থনে সরকার। কাজেই সার্বভৌম রাষ্ট্রের যে সার্বভৌম ক্ষমতা তার সামান্যও আমাদের প্রয়োগ করার ক্ষমতা নেই। এই কারণেই সার্বিক জনকল্যাণে নির্দেশিত হলেও 'কমান্ডিজম' দ্বন্দ্ব নিরসনের উপায় নয় যেমন 'নন্দীগ্রাম'। পারসুয়েসনই একমাত্র খোলা পথ শ্রেয় পথ। তবে এই বিশ্বাস আমাদের আছে সাধারণ কৃষক যারা বড় জোতের মালিক নয় তাদের সঙ্গে বিরোধ সেটা মোটেই বৈরীমূলক নয়। এর অনেকটাই বিভ্রান্তিমূলক রাজনৈতিক স্বার্থান্বেষীদের উসকানি, ও প্রারোচনামূলক। সবই বামফ্রন্ট সরকারের জনস্বার্থবাহী কর্মসূচি, কর্মোদ্যোগকে বিপর্যস্ত বানচাল করে শোষকশ্রেণির ও কায়েমীস্বার্থের অবাধ শোষন প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখার ষড়যন্ত্র কূটকৌশল। আর আপাত লক্ষ্য সস্তায় বাজার মাৎ করে নির্বাচনে সফল হয়ে লালবাতির গাড়ি চড়া।

বামফ্রন্টের ব্যাপক বহুমূখী শিল্পনীতি প্রণয়ন এবং রাজ্যজুড়ে শিল্পায়নের উদ্যোগ খুবই সময়োপযোগী, তাৎপর্যপূর্ণ এবং জরুরী। কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে হাজার হাজার কর্মহীন যুবক-যুবতীর। শিক্ষিত, শিক্ষিত নয় সবার কাছে। নানা বিচিত্র শিল্পজাত দ্রব্য ব্যবহারে আসবে অনেক মানুষের। এখনওতো মাথা পিছু শিল্পজাত দ্রব্যের ব্যবহার পৃথিবীর অনেক দেশ থেকেই পিছিয়ে আমরা। জীবিকার উৎসের প্রসার আয় বাড়াবে। বাড়াবে ক্রয়ক্ষমতা। ঘটবে জীবনের মানোন্নয়ন। একটি শিল্পকে ঘিরে হবে নগরায়ন। বিস্তৃত হবে ব্যবসা-বাণিজ্যের সমূহ পথ। হবে নতুন নতুন

বাসস্থান স্কুল কলেজ হাসপাতাল যানবাহন কী নয়! হাজার হাজার বছর আগের গ্রামীণ সভ্যতাই উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করে নগরায়নের, শিল্পায়নের। চমৎকৃত হতে হয় দেখে যে চারপাঁচ হাজার বছর পূর্বে লোহা, তামা এমন কী মিশ্রধাতু ব্যবহার ছিল উন্নত যাপনের প্রয়োজনে। নন্দীগ্রাম, সিঙ্গুর, কী অন্যত্র শিল্প গড়ার বিষয়ে যে জটিলতার সম্মূখীন হতে হয়েছে সে সম্পর্কে গভীর আত্মসমীক্ষার প্রয়োজন আছে। দ্বন্দ্ব বা বিরোধের উৎস কোথায়, বাস্তব ভিত্তিই বা কী এসবের নিরপেক্ষ নির্মোহ পর্যালোচনা প্রয়োজন। ঐসব প্রশ্ন সামনে রেখে পরবর্তী স্থানীয় নির্বাচনগুলোয় যে মানুষের ঝোঁক লক্ষ্য করা গেছে সেটা অস্বীকার করার উপায় নেই। কী কী শিল্প হবে এবং তার স্থান নির্বাচন এসব বিষয়ে সরকারের আরো সচেতন ভাবনা এবং বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়। একথা বিস্মৃত হলে চলেবে না যে শিল্পপতিদের দায়বদ্ধতা মুনাফা অতিমুনাফার প্রতি যত, সমাজের প্রতি তার কিঞ্চিতও নেই। থাকার কথাও নয়। তাহলে টাটা থাকত। ঝামেলাতো কমে আসছিল। জামশেদপুর বা পুনে বা যে কোনো শিল্পনগরী দেখে কী মনে হয় সেখানে সাধারণ মানুষের কোনো ঠাঁই আছে! একসময় তো নামমাত্র মূল্যে বা জোরজবরদস্তি করেই টাটা নগরের আদিবাসীদের উৎখাত হতে হয়েছিল। নগর সীমান্তে জঙ্গলে নিতে হয়েছিল ঠাঁই। তাদের ছেড়ে যাওয়া শহরের জমি হয়েছে এখনসোনা। আর কোম্পানির শেয়ারের লাভের অংশ ডিভিডেন্ড! না বলাই ভালো। শৌখিন নাম রেখেছে শেয়ারের — Blue chips.আইনের চোখে জামশেদপুর আজও টাটার জমিদারি হিসাবেই গণ্য, স্বীকৃত। আজ না হয় মানুষ সচেতন হওয়ায় ক্ষতিপূরণের আকর্ষনীয় প্যাকেজ এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হচ্ছে। আর একটি বিষয়েও বামফ্রন্ট সরকারকে একটু সাবধনতা অবলম্বন করতে হবে বলে মনে হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের সরকার। শিল্পের জন্য চুক্তি, উদ্বোধন তথাকথিত শিলান্যাস এসব অনুষ্ঠানগুলোয় জাঁকজমক যত কম হয় ততই ভালো। এসবে মানুষের দূরত্বটাই বাড়ে বলে মনে হয়। শাল, উত্তরীয়, মালা বদল কেন? দূরের দৃষ্টিতে দেখলে এগুলোতে ফাঁসও হতে পারে।

এসব প্রান্তিক প্রশ্নকে গুরুত্ব না দিয়েই শিল্পায়নের মত সৃষ্টিধর্মী, একান্ত অপরিহার্য এবং আগুয়ান ভাবনার বিশেষত্ব ও তাৎপর্য বুঝতে হবে। একটি শিল্প তার বৃত্তের ভিন্ন ভিন্ন ঘেরে আরো অনেক ছোটবড় শিল্প ও অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের জন্ম দেয়। উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে, সংগঠনে উৎপাদন শক্তিতে আনে জোয়ার। ফলে সামাগ্রিক উৎপাদন হার বেড়ে সম্পদশালী হয় দেশ। জীবনের মান উন্নয়নের পথ যায় খুলে। যন্ত্রের সংস্পর্শে এবং সংশিষ্ট বিচিত্র ক্রিয়াকলাপে মানুষের মানসজগৎ হয় সমৃদ্ধ শানিত। জন্ম নেয় বিজ্ঞান মনস্কতা। সভ্যতার অগ্রগতির জন্য গ্রামীন মানুষের প্রধানত সামন্তবাদী চিন্তাধারায় রূপান্তর ঘটানো যে নিতান্ত প্রয়োজন! শিল্পের বিস্তার প্রতীকীরূপে হলেও সম্ভব করে তোলা প্রয়োজন রাজ্যের জেলায় জেলায়। প্রত্যন্ত প্রান্তে। শিল্পস্থাপনা মানে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকে মজবুত করার লক্ষ্যে বীজবোনা ফলফলানো। যার ফল অনিবার্য ভাবেই সার্বিক এবং সুদূরপ্রসারী। এর প্রস্ফুটিত পরিনাম এই মুহূর্তে কারো কারো স্নেহছায়া থেকে বঞ্চিত হলেও অদূরভবিষ্যতেই এর কল্যাণীয়রূপ মুগ্ধ করবে সবাইকেই। প্রাচীন সভ্যতা যার জ্বলন্ত সাক্ষি। এসম্পর্কে অর্থাৎ সৃষ্টির রহস্য এবং এর তাৎপর্য নিয়ে রবিঠাকুরের লেখাই পড়ি,— ' বিশ্ববিধি একটা নিয়ম এই দেখিতেছি যে, যেটা আসন্ন, যেটা উপস্থিত, তাহাকে সে খর্ব করিতে দেয় না। তাহাকে এ কথা জানিয়ে দেয় না যে, সে একটা সোপান পরম্পরার অঙ্গ। তাহাকে

বুঝাইয়া দেয় যে, সে আপনাতে আপনি পর্যাপ্ত। ফুল যখন ফুটিয়া উঠে তখন মনে হয়, ফুলই যেন গাছের একমাত্র লক্ষ্য — এমনি তাহার সৌন্দর্য, এমনি তাহার সুগন্ধ যে মনে হয় যেন সে বনলক্ষ্মীর সাধনার চরমধন। কিন্তু সে যে ফুল ফলাইবার উপলক্ষ্য মাত্র সে কথা গোপনে থাকে — বর্ত্তমানের গৌরবেই সে প্রফুল্ল, ভবিষ্যৎ তাহাকে অভিভূত করিয়া দেয় না। আবার ফলকে দেখিলে মনে হয়, সেই যেন সফলতার চূড়ান্ত। কিন্তু ভাবী তরুর জন্য সে যে বীজকে গর্ভের মধ্যে পরিণত করিয়া তুলিতেছে, এ কথা অন্তরালেই থাকিয়া যায়। এমনি করিয়া প্রকৃতি ফুলের মধ্যে ফুলের চরমতা, ফলের মধ্যে ফলের চরমতা রক্ষা করিয়াও তাহাদের অতীত একটি পরিণামকে অলক্ষ্যে অগ্রসর করিয়া দিতেছে।'

মনে রাখতে হবে রবিঠাকুরের আর একটি কথাও, 'পৃথিবীর সমস্ত বড়ো বড়ো সভ্যতাই দুঃসাহসের সৃষ্টি। শক্তির দুঃসাহস, বুদ্ধির দুঃসাহস, আকাঙক্ষার দুঃসাহস।'

আমাদের কাজে শৈথিল্য আর দ্বিধার অবকাশ কোথাও?

শৈবাল চক্রবর্তী / ভারতী সিদ্ধি

সেটা মনে হয় ১৯৬৮ কিংবা ৬৯ সাল হবে। কলেজে পড়ছি আর সময় পেলেই কাব্য সাহিত্যের আখড়ায় সুযোগমত হাজিরা দিচ্ছি, দু-চারটে লিটিল ম্যাগাজিনে দু-চারটে ছোটগল্প, কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। আমার সেইসব মানসিক উন্মেষের দিনে যাঁরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সহায়কে কাজ করেছেন আমার মেজদাদু ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। সেই মেজদাদু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে হঠাৎ একদিন বললেন,

— এই নাতি, হিংলাজ বলে একটা জায়গা আছে জানিস?

— হ্যাঁ জানি বৈকি(হিংলাজ একান্ন মতান্তরে বাহান্ন তন্ত্রপীঠের অন্যতম। মরুভূমির মধ্যে পাহাড়ী গুহাভ্যন্তরে অবস্থিত জ্যোতির্পীঠ। অধুনা পাকিস্তানের অন্তর্গত, তৎকালীন লাসবেলা

স্টেটের অধীনে 'হাব' নদীর তীরে অবস্থিত এই মরুতীর্থ হিংলাজ, পুরাণ মতে এখানে সতীমাতার ব্রহ্মরন্ধ্র পড়েছিল, এই তীর্থে পৌঁছানোর মরুপথ অতীব দুর্গম — বলে আমি থামলাম।

— ওঃ বইটা তাহলে পড়া হয়ে গেছে? দাদুর জিজ্ঞাসা। বললাম, হ্যাঁ, আর সিনেমাটাও দেখা হয়ে গেছে। দাদু হাসলেন। আমার পড়াশোনার বদঅভ্যাসের কথাটা তিনি বিলক্ষণ জানতেন। রতনে রতন চেনে অর্থাৎ এই বদঅভ্যাসের অভ্যেসটা তাঁরও আছে। বললেন, কেমন লাগল রে? বললাম, ভালো।

— কোনটা ভালো, বইটা না সিনেমাটা।

— দুটোই। তবে যাই বলুন দাদু,বই পড়ার মজাটাই আলাদা। একাধারে কাহিনি বিন্যাস, তার সঙ্গে চরিত্র চিত্রন, এই ভ্রমন কাহিনিতে কোন চরিত্রই কাল্পনিক নয়, সৃষ্টিও নয়, ভ্রমনের পর্যায়ে যারা এসেছে তাদের কথাই লেখক লিখেছেন, তাঁর নিজের মত করে। তা লেখকের সঙ্গে আলাপ করতে ইচ্ছে হয়না তোর? দাদুর সরাসরি প্রশ্নে আমি অবাক হয়ে বললাম, সেকি দাদু, এতবড় লেখক, অবধূত বলে কথা, তিনি আমার সঙ্গে কথা বলবেন কেন?

— বলবে বলবে। চুঁচুড়ায় গঙ্গার তীরে তাঁর ডেরা। কালিকানন্দ আমার দীর্ঘদিনের পরিচিত। আমি প্রায়ই যাই। তোর যদি ইচ্ছে হয় তবে আমার সঙ্গে যেতে পারিস, খুব মজা পাবি। দাদুর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বললাম,— যাব না মানে? আলবৎ যাব। তা কবে যাওয়া হচ্ছে দাদু?

— আগামী রবিবার সকাল আটটায়, হাওড়া স্টেশনে বড়ঘড়ির তলায় দাঁড়াবি। আমি এসে তোকে নিয়ে চুঁচড়ায় যাব।

দাদুর কথা শুনে আমি শুধু বললাম, 'দারুণ'।

যে সময়ের কথা বলছি সে সময় বারুদগন্ধ বুকে নিয়ে কলকাতার আকাশে জ্যোৎস্না ফুটছে। কলকাতা আখ্যায়িত হয়েছে শে-াগানের শহর নামে।

এখানে মেজদাদু সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা যেতে পারে। আমার এই মেজদাদুর নাম শ্যামাশংকর চক্রবর্তী, সম্পর্কে আমার মায়ের মেজমামা। মধ্যদেহী, সুদর্শন, সদালাপী, পরিহাসপ্রিয়,

নিরামিশ ভোজী এবং অকৃতদার। পেশায় সাংবাদিক। বসতবাড়ি তারকেশ্বর ধামে পঞ্চায়েৎ নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকার সহসম্পাদনা করতেন। পরে থাকতেন ধূতিপাঞ্জাবী। ভাল আতর ব্যবহার করতে ভালবাসতেন (আমার আতর ব্যবহারের নেশাটা সম্ভবত ওঁর কাছ থেকেই সংক্রামিত হয়েছে) শহর কলকাতা পায়ে হেঁটে বেড়িয়েছেন, ভারতভ্রমন করেছেন বেশ কয়েকবার। সে সময়ের যত কবি শিল্পী, সাহিত্যিক, ভ্রমনপিপাসু, চিত্রকর এবং রাজনীতিবিদের সঙ্গে তাঁর ঘণিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তাঁর সঙ্গে কত জায়গায় কতজনের সঙ্গে যে সাক্ষাৎ করেছি সেকথা ভাবলে নস্টালজিয়ায় আক্রান্ত হতে হয়। মনে পড়ে তৎকালীন নীরব কবি কাজি নজরুল ইসলামের ট্যাংরার ক্রিস্টোফার রোডের ফ্ল্যাটে আমাকে তিনি সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। কবিসহ কবির পরিবারের সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। আলাপ করে দিয়েছিলেন তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেশ বসুর সঙ্গে। গতশতাব্দির সাতের দশকে তার সঙ্গে আমার প্রথম তারাপীঠ বক্রেশ্বর ও শান্তিনিকেতন ভ্রমন। সেই মেজদাদুর সঙ্গে পৌঁছালাম চুঁচুড়ায় গঙ্গাতীরে মরুতীর্থ হিংলাজের স্রষ্টা কালিকানন্দ অবধূতের ডেরায়।

তারপর মানুষটাকে দেখা, কতকিছু শোনা, কতই না জানা, কত প্রশ্নের উত্তর অতিন্দ্রীয় রহস্যময়তার স্পর্শলাভ। সে আমার নিজেকে চেনার দিনে বেলাঅবেলায় তথ্য ও তত্ত্ব সম্পদ আহরণের কথা, কিন্তু সে কথা থাক, কেমন করে মরুতীর্থ হিংলাজের মত বা উদ্ধারণপুরের ঘাটের মত ভিন্নস্বাদের সাহিত্য সৃষ্টি বাঙালি পাঠকদের পাতে এসে পড়ল সে কথাই বলি, যে কথা বলতে চাইছি তার কিছু অবধূতের কাছ থেকে কিছু আমার ঐ সাংবাদিক মেজদাদুর কাছ থেকে শোনা বা জানা, আর বাকিটা আমার নিজস্ব উপলব্ধির প্রকাশ।

কালিকানন্দ অবধূত তার পরিব্রাজক জীবনে দুঃসাহসের পাখায় ভর করে দুর্গম মরুতীর্থ হিংলাজ গিয়েছিলেন, সঙ্গে ছিলেন ভৈরবী, মরুতীর্থ হিংলাজ নামের ভ্রমন উপন্যাসটির পাতায় পাতায় সেই যাত্রার দুঃসহ এবং দুঃসাহসিক বর্ণনা অনেকেই পড়েছেন। বিকাশ রায়, উত্তমকুমারের অভিনয় সমৃদ্ধ সিনেমাটিও দেখেছেন। অবধূত তাঁর অনুরাগীদের কাছে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণের অভিজ্ঞতার কথা বলতেন। বলতেন দুর দুর্গমে তীর্থভ্রমণের কষ্টের কথা আবার অপার আনন্দ বা প্রকৃতি চৈতন্যের অনুভূতি লাভের কথা, কখনও বা বিবৃত করতেন নিসর্গের সীমানা ছাড়িয়ে অনৈসর্গিক জীবনে উত্তরণের কথা, ভ্রমণকালীন সময়ে চলার পথে কতভাবে কতসাথী কাছাকাছি এসেছে আবার দুরেও সরে গিয়েছে, বলতেন তাদের কথা, এই সব বর্ণনার ভেতর থেকে উঠে আসত বিচিত্র সব চরিত্র, মরুতীর্থ হিংলাজের পাতায় যেমন বিচিত্র হয়ে আছে থিরুমল, কুন্তা বা অন্যান্য চরিত্ররা।

ঐ অনুরাগীজনদের মধ্যে অনেকেই যাঁদের মধ্যে আমার মেজদাদুও ছিলেন। তাঁরা প্রায়শই অনুরোধ করতেন অবধূতের ভ্রমন অভিজ্ঞতার বৃত্তান্তগুলো লিখে ফেলার জন্য। ক-জনই বা হিংলাজ তীর্থ দর্শন করার সুযোগ পাবে। আর দেশ ভাগের পর পাশপোর্ট-ভিসা নিয়ে কতজনই বা দূর-দুর্গমের ওই মরুতীর্থে ভবিষ্যতের যাত্রী হবে তা সন্দেহের বিষয়। তাই লেখা থাকলে অবধূতের চোখে ভবিষ্যতের বাঙ্গালী হিংলাজ দর্শনের কিঞ্চিৎ সৌরভটুকু নিতে পারবে।

পরবর্তী সময় অবধূতকে এবিষয়ে জিজ্ঞার উত্তরে বলেছিলেন, অমিতো লেখাপড়া জানা শিক্ষিত মানুষ নই, দেখছিস না বসতির একদম প্রান্তে একান্তে বাস করি, লোকসংগে মিশতেও পারিনা, সামনে আমার ভাগিরথী আর পিছনে ভৈরবী, কথাগুলো বলে হেসেছিলেন অবধূত। তবুও তাঁর বর্ণনায় যে সব জীবন্ত দৃশ্য ভেসে ওঠে তা হারিয়ে যাবে ভাবা যায় না। অনেকবার অনুরোধ করাতে অবধূত বললেন, 'দেখি। লেখা তো আমার আসে না, কিন্তু আপনারা সবাই চাইছেন।' তারপর স্বগতোক্তির মতো বললেন, 'কলমসিদ্ধি লাভ ছাড়া লেখা আসবেই বা কি ভাবে — তাও দেখি।

এরপর তিনমাস চুঁচুড়া যাওয়া হয়নি। দাদু বলছেন, হঠাৎ গিয়ে উপস্থিত হয়েছি। আমাকে দেখে অবধূত বললেন, 'এসো শ্যামাশংকর, এবার অনেকদিন পরে এলে মনে হচ্ছে। তোমায় একটা জিনিস দেখাই। মুখ ঘুরিয়ে ভৈরবীকে বললেন, ওইটা দিয়ে যাও।'

ভৈরবী একতাড়া ফুলস্কেপ কাগজ আমার হাতে ধরিয়ে বললেন, 'পড়ে দেখো।'

পাতা উল্টে চলেছি। রাত বেড়ে গেছে নিঃশব্দে। মোহভঙ্গ হল অবধূতের কণ্ঠস্বরে, 'এখনও শেষ করতে পারিনি। একটু একটু করে স্মৃতি হাতড়ে সব বের করতে হচ্ছে কিনা' একটু হেসে অবধূত বললেন, 'কেমন লাগছে বলো?'

বাকরুদ্ধ অবস্থায় বাড়ি ফিরে এলাম। এই প্রসঙ্গ উত্থাপিত হল কথাসাহিত্যিক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। তিনি লেখা এবং লেখক সম্বন্ধে খুবই আগ্রহ প্রকাশ করলেন। সেই পাণ্ডুলিপি তারাশংকরবাবুর কাছে পৌঁছানও হল।

তার কিছুদিন পরে তারাশংকরবাবুর বাড়িতে গিয়েছি। কয়েজন বিদগ্ধ ব্যক্তিত্ব তাঁর সামনে বসে। আমাকে দেখেই বলে উঠলেন, 'বুঝলে শ্যামাশংকর বাঙ্গালী পাঠক এক অনাস্বাদিত সাহিত্যের ভোজে আমন্ত্রিত হতে চলেছে।' পাশে রাখা পাণ্ডুলিপিটি দেখিয়ে বললেন, 'মরুতীর্থ হিংলাজ আজ অনেকেই যেতে পারবে না। আর তার দরকারও নেই। ঘরে বসেই ওই দুর্গম মরুতীর্থ ভ্রমনের আনন্দ উপভোগ করতে পারবে।

' কেমন বুঝলেন?' আমার প্রশ্নে আমার দিকে চোখ তুলে বললেন, 'অনবদ্য, এককথায় অসাধারণ।'

'তাহলে গ্রন্থাকারে প্রকাশের একটা ব্যবস্থা যদি —' আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই তিনি বললেন, 'ও নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না, ব্যবস্থা হয়ে গেছে। কিন্তু অবধূতের সঙ্গে আমি দেখা করতে যাব কবে?

হ্যাঁ, তারাশংকরবাবু সাক্ষাৎ করেছিলেন অবধূতের সংগে। তিনি বিস্মিত দৃষ্টিতে দেখেছিলেন শীর্ণকায় রক্তবস্ত্র পরিহিত সাধক লেখককে। আর অবধূতও দেখেছিলেন খর্বকায় সাধারণ দর্শনের কথাসাহিত্যিক তারাশংকরবাবুকে।

'এরকম অসাধারণ লেখা কেমন কোরে লিখলেন, আর এরকম বিশে-ষন — বাংলা সাহিত্যে এরকম ভ্রমণ উপন্যাস আগে লেখা হয়েছে কিনা জানা নেই।' তারাশংকরের প্রশ্নের উত্তরে অবধূত বললেন,'না, এই সবাই মিলে তাড়া দিল — আমি না শিখেছি লেখাপড়া, না জানি লিখতে।'

'তাহলে কি করে আপনার হাতে উঠে এল দুর্গম মরুপথের এরকম বর্ণনা, থিরুমল-কুন্তার মত চরিত্র!'

'ওরা তো সব আমার চোখে দেখা চরিত্র। আর আমি তো সাধক, ভারতীসাধনা আর লেখনী সিদ্ধির দৌলতে স্মৃতিতে যা এসেছে তাই লিখে ফেলেছি। আপনাদের কথা মনে শুনে মনে হচ্ছে, লেখাটা বোধহয় তত কঠিন নয়।'

'লিখুন, আরো লিখুন, বাঙ্গালী পাঠককে আরো কিছু অজানার সন্ধান দিন।' স্মিত হেসে বললেন তারাশংকর।

এরপরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত, মরুতীর্থ হিংলাজ আত্মপ্রকাশ করার পরে পরে মুক্তি পেল ওই নামের ছায়াছবি। দুটোই মোহিত করল বাঙ্গালীকে। এরপরে পাঠকের হাতে এল উদ্ধারণপুরের ঘাটের মত

অজানা রহস্যলোকের কথা।

দিন গড়িয়ে গেছে, মাস বৎসর গড়িয়ে গেছে, চুঁচুড়ার ভাগিরথী তীরে কালিকানন্দ অবধূত আর নেই, নেই তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত অবিস্মরণীয় কথাসাহিত্যিক, তারকেশ্বর থেকে প্রকাশিত 'পঞ্চায়েৎ' পত্রিকার সহ-সম্পাদক শ্যামাশংকর চক্রবর্তীও আজ পরপারে। এঁদের সংগে মিশেছি, শুনেছি অনেক কথা, জেনেছি হয়তো আরো বেশি, সোনায় মোড়া ভবিষ্যতের সন্ধানে ছুটে চলা। আজকের বাঙ্গালী প্রজন্ম বিশ্বায়নের আবর্তে, এঁদের কথা ভাল করে জানেনা, জানতে চায়ওনা — ক্ষোভ শুধু এখানেই।

বিষ্ণু বিশ্বাস

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় - একটি সংক্ষিপ্ততম পরিচয়

পরাক্রান্ত জিউসের সমস্ত প্রচেষ্টা নিস্ফল করে বিদ্রোহী প্রমিথিউস অলিম্পাস পাহাড়ের শীর্ষে রক্ষিত অগ্নিমশাল থেকে আগুনের টুকরো এনে তুলে দিয়েছিল মানুষের হাতে। ক্ষিপ্ত জিউস প্রমিথিউসকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে হিংস্র ঈগলপাখিকে লেলিয়ে দিয়ে তাকে ধ্বংস করতে চাইল। কিন্তু প্রমিথিউসের মৃত্যু নেই। যতবার তাকে ধ্বংস করা হল ততবারই নতুন শক্তি সঞ্চয় করে সে জেগে উঠল।

মৃত্যু নেই যুগযুগান্ত যাঁরা প্রমিথিউসের পথে হেঁটে চলেছেন। মৃত্যু হয়নি অ্যানাকসাগোরাস, জিয়োর্দানো ব্রুনো, গ্যালিলিও গ্যালিলেই, ইবন রুস্‌দের। মৃত্যু নেই ভিভিয়ান লুই ডিরোজিও, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বেগম রোকেয়ার। পরবর্তী প্রজন্মের হাতে প্রমিথিউসের মশাল তুলে দিয়ে তাঁরা দায়িত্ব থেকে অবসর নিয়েছেন মাত্র।

গত ১৭ই নভেম্বর ২০০৮ আমাদের জিম্মায় প্রমিথিউসের মশাল গচ্ছিত রেখে চলে গেলেন অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়। আশির দশকের শুরুতে আমাদের মধ্যে প্রবল অস্তিত্ব নিয়ে ধূমকেতুর মতো উপস্থিত হয়েছিলেন তিনি। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানপত্রিকা! আমরা অনেকেই প্রথমটায় খুব একটা উৎসাহিত হইনি। 'উৎস মানুষ' প্রথম সংখ্যা (সম্ভবত জানুয়ারি, ১৯৮০) হাতে নিয়ে আক্ষরিক অর্থেই শিহরিত হয়েছিলাম। বিজ্ঞানপত্রিকা — কিন্তু খটোমটো থিয়োরি, ল আর এক্সপিরিমেন্ট কন্টকিত নয়। বুঝলাম 'উৎস মানুষ' সেই অর্থে বিজ্ঞানপত্রিকা নয়। উৎস মানুষ আসলে বিজ্ঞান মনস্কতার পত্রিকা, বিজ্ঞান সম্মত দৃষ্টিভঙ্গির পত্রিকা ।

রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন 'তন্ত্র মন্ত্র সংহিতায় চরণ না সরে।' অশোকদা এই তন্ত্র মন্ত্রর বন্ধন ছিন্ন করে আমাদের দুপায়ে এনে দিলেন দুর্বার গতি। গ্রহরত্ন, তাগা তাবিজ, হাঁচি টিকটিকি, শূন্য কলসি আমাদের চলার বেগে খানখান হয়ে গেল। অশোকদার শে-াগান ছিল 'বিজ্ঞানকে বই-এর পাতায় বন্দি করে রাখব না। সব কিছুতে

খুঁজব কারণ অন্ধভাবে মানব না।' এই শে-াগান আমাদের চিন্তার জগতে ঘূর্ণিঝড় তুলে দিল। আমাদের তারুণ্য তখন ধাবমান অশ্বের মতো ফুটছে। নিরুচ্চার শপথ নিলাম কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বেদিমূলে আমাদের চক্ষু কর্ণ এবং মস্তিষ্ক আর গচ্ছিত রাখা নয়। প্রতিদিন প্রতিক্ষণ কী ও কেন বলে আমাদের প্রশ্ন তুলতেই হবে। এ আমাদের দায়িত্ব, আমাদের অধিকার।

কোনো কিছুকে অন্ধভাবে না মানার এই উৎস মানুষীয় অঙ্গীকার আমাদের অন্তর্গত রক্তের মধ্যে আশ্চর্য দক্ষতায় চারিয়ে দিয়েছিলেন অশোকদা । তখন আর শুধু তাগা তাবিজ, বুজরুক গুরুবাবা কিংবা জ্যোতিষ গণনার আদ্যপ্রান্ত ভণ্ডামির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশেই থেমে থাকল না আমাদের অপার অন্তহীন জিজ্ঞাসা। 'উৎস মানুষ'-এর পাতায় প্রশ্ন উঠে এল বড়ো বাঁধের প্রাসঙ্গিকতা, পরমাণুচুল্লির প্রয়োজনীয়তা, উন্নত চাষের নামে জননী বসুন্ধরাকে যথেচ্ছ ধর্ষণের সুদূর প্রসারি পরিণাম ইত্যাদি ইত্যাদি নিয়ে।

যাঁদের এতদিন দেবতার আসনে বসিয়ে ধূপের ধোঁয়া আর পুষ্পের স্তূপে আড়ালে রেখেছিলাম তাঁদের নিয়েও প্রশ্ন তোলার সাহস জোগালেন অশোকদা। আবার যাঁদের প্রতি তুচ্ছজ্ঞানে এযাবৎকাল মুখ ফিরিয়ে রেখেছিলাম তাঁদের মধ্যে মনুষ্যত্বের সন্ধান পেয়ে আলো খেলে গেল আমাদের মস্তিষ্কের অন্ধকার কোণে ।

'উৎস মানুষ'-এর পাতায় কোনো প্রশ্নই এড়িয়ে যাননি আশোকদা। প্রশ্ন উত্থাপনের অমোঘ অধিকারে তাঁর বিশ্বাস স্থির ছিল শেষদিন পর্যন্ত। আমার সংগৃহীত শেষ সংখ্যাটিতেও (জানুয়ারি, ২০০৮) আমরা ঋজু, সমুন্নত, আপোষহীন চেনা অশোকদাকেই পেয়েছি। প্রচন্ড শারীরিক অসুস্থতার মধ্যেও তিনি শেষ সংখ্যাটি সাজিয়েছিলেন তসলিমা নাসরিন, রিজওয়ানুর রহমান, সিঙ্গুর এবং নন্দীগ্রাম নিয়ে।

শ্রীরামপুর শহরে 'উৎস মানুষ'-এর আড্ডা বসেছিল ১৯৯৮ সালে। আমরা শ্রীরামপুরের ডিরোজিয়ানরা সেই আড্ডার উদ্যোক্তা ছিলাম। অশোকদা মাত্র সাতটি শব্দের কবিতা আমাকে দিয়েছিলেন 'উৎস মানুষ'-এর পরিচয়জ্ঞাপক পোষ্টার করার জন্য । ''ফুল ফোটায়, হুল ফোটায়, ভালোবাসে, ভিত নাড়ায়।''

আজ মনে হচ্ছে এই সাত শব্দেই ধরা আছে অশোকদার সাত সমুদ্র পরিচয়।

লীনা চাকী / খেলা

অনি,

‘কাল রাতে তুমি বেশ অবাক হয়েছিলে আমার কথা শুনে। সেটাই স্বাভাবিক। আমি তোমাকে যা বলতে চেয়েছিলাম, সেটা পরিষ্কার করে বলতে আমার কুণ্ঠা হচ্ছিল। ভাবছিলাম তুমি ঠিক কীভাবে নেবে কথাটা। তাই এই চিঠি। মনে হল, তোমাকে যা লিখে বোঝাতে পারব তা তোমার সামনে দাঁড়িয়ে, তোমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলা সম্ভব নয়। অনি, আমি আসলে একা থাকতে চাই। একা, মানে নিজের সঙ্গে। নিজেকে নিয়ে।’

এই পর্যন্ত লিখে রিমি অস্থিরভাবে উঠে দাঁড়াল। পেনটা হাতের মুঠোয়। এবারে কি লিখবে? কী লিখলে অনিরুদ্ধকে আঘাত করা হবে না। অসম্মান করা হবে না। ও চঞ্চল হয়ে পড়বে না। কিংবা ওকে ভুল বুঝবে না। খুবই দিশাহারা লাগে রিমির। সারারাত অনিরুদ্ধর পাশে শুয়ে ঘুমোতে পর্যন্ত পারেনি।

অনিরুদ্ধও দীর্ঘক্ষণ জেগে ছিল। কিন্তু কেউ কারও সঙ্গে বাক্য বিনিময় করেনি। কারণ খাবার টেবিলে ও অনিরুদ্ধকে যা বোঝাতে চেয়েছিল, সেটা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছে। এখন সেই অবাক চাহনি ওর সামনে। অনিরুদ্ধ রুটি ছিঁড়িছিল। হাত থেমে গিয়েছিল। অবাক হয়ে খানিকক্ষণ তাকিয়েছিল রিমির দিকে।

এখন রিমির মনে হচ্ছে কথাটা তখন না বললেই ভালো হত। অনিরুদ্ধ টেবিল ছেড়ে উঠে গিয়েছিল। রিমিকে তখনই প্রবল বিষণ্ণতা গ্রাস করে ফেলেছিল। অপরাধবোধও। কিন্তু তবুও বুকের মধ্যে একটা হালকা ভালোলাগা ডানা ঝাপটে উঠে বসেছিল। মনে হচ্ছিল মুক্তির স্বাদ আবার ফিরে পাচ্ছে। যা বলার জন্য ও গত দশ দিন ধরে নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে, নানা যুক্তি একবার ওর পক্ষে একবার অনিরুদ্ধর পক্ষে দাঁড় করিয়ে নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলেছে, সেটা বলে ফেলতে পেরে ও বড় করে শ্বাস ফেলেছে। এবারে অনিরুদ্ধকে বোঝানো দরকার। বিশদে। সেটা কথায় নয়, লিখে জানানোটাই এখন সোয়াস্তির। কারণ অনিরুদ্ধ তো বলতেই পারে, আমি তো তোমার সঙ্গে জোর করে থাকতে চাইনি। প্রস্তাবটা তোমারই ছিল। তুমিই বলেছিলে ‘আমরা একসঙ্গে থাকতে পারি না?’

রিমি জানালার সামনে। এখান থেকে একটা রাস্তা দেখা যায়, যে রাস্তাটা গিয়ে মিশেছে রাসবিহারি অ্যাভিনিউয়ের জংশনের কাছে। ও ঠিক তিনমাস আগে এখানেই অপেক্ষা করত অনিরুদ্ধর জন্য। অনিরুদ্ধ তখন ওর সঙ্গে থাকতে শুরু করেছে লিভ টুগেদার আখ্যায়। ও ঘড়ি দেখত আর রাস্তা দেখত। বুকের মধ্যে একটা খাঁ খাঁ ভাব। সেই মানুষটাকে দেখার জন্য ব্যাকুলতা। একটা সময় গলির মুখে দেখা যেত অনিরুদ্ধকে। রাতে ল্যাম্পপোস্টের আলোয় ছায়া-ছায়া লাগত। তবুও ও বুঝে যেত ওই ছায়ামানুষটাই ওর ভালবাসা। বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠত ভাললাগায়। শরীরে ধেয়ে আসত কামের জোয়ার। তারপর কত রাত পর্যন্ত অনিরুদ্ধর স্টুডিওপাড়ার গল্প, ওর লেখালেখির কথা। হালকা-পলকা খুনসুটি, বিছানায় বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস। এখন ওর কেমন দমবন্ধ

লাগে। কতা ভালো লাগে না। অনিরুদ্ধ কথা বলে যায়, ও বাবে কখন কথা বন্ধ হবে। ও চুপ করে থাকে ঘন্টার পর ঘন্টা। ধৈর্য ধরে। এখন অনিরুদ্ধ দেরি করে ফিরলে ওর ভালো লাগে। একা অনেকক্ষণ থাকতে পারবে ভেবে আনন্দিত হয়। একা থাকা, একা হওয়ার তীব্র বাসনা ওকে সারাক্ষণ বড্ড গ্রাস করে থাকে। অনিরুদ্ধ সম্পর্কে এখন তাই নতুন করে ভাবতে হচ্ছে।

গতরাতে কী বলেছিল সেটা আবার সামনে ধরে রিমি। আবার ওর সংলাপটা নিজের কানে শুনতে চায়। ও বলছিল,‘‘অনি, এমন হয় না, ধর আমরা একসঙ্গে থাকব না। কিন্তু রোজ দেখা হবে। রোজ কতা হবে। কথার শেষে আমরা যে যার বাড়িতে ফিরে যাব। এটা কি করা যায়?’’

অনিরুদ্ধ কোনও উত্তর দেয়নি। ও অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল, বেশ খানিকক্ষণ। কোনও উত্তর দেয়নি। কাল রাত থেকে কোনও কথা বলেনি অনিরুদ্ধ। গম্ভীর , অন্যমনস্ক। অনিরুদ্ধ পালটা কিছু বললে বা প্রশ্ন তুললে ঠিক হত, স্বাভাবিক হত অনেক কিছু। অনিরুদ্ধজানতে চাইতে পারত, কেন এইরকম কথা বলছে। বা কোনও প্রশ্ন তুলতে পারত, রাগ করতে পারত, ওকে অপমান করতে পারত। তাহলে ও বলত, ‘‘আসলে রোজ মনে হয় আমার একা থাকাটা খুব লোভনীয় ছিল। একা ভালো ছিলাম বলব না। কিন্তু তখন একরকম জীবন ছিল, নিজের মতো করে। সেই নিজের মতো জীবনটা যেন হারিয়ে গেছে। সেই জীবনটা ফের পেতে ইচ্ছা করে।’’

এই কথার পিঠে অনিরুদ্ধ নিশ্চয় অপমানিত হয়ে বলত,‘‘তার মানে তোমার ইচ্ছা হয়েছিল বলেই তুমি এবাড়িতে আমাকে থাকতে দিয়েছিলে, আমার সঙ্গ পেতে চেয়েছিলে। এখন আবার একা থাকতে চাইছ বলে আমাকে চলে যেতে বলছো?’’

এই সংলাপটা ভাবতে গিয়ে রিমি থমকাল। অনিরুদ্ধ খুব খোলামেলা, উচ্ছল। কিন্তু ঝগড়া, রাগারাগি করতে জানে না। তর্ক করতে ভালবসে, কিন্তু ঠিক সময়ে থামতে জানে। সুতরাং পালটা প্রশ্ন না তুলে অন্যভাবে বলত। অনিরুদ্ধ তার চরিত্র অনুযায়ী বলতে পারত, ‘‘একা ছিলে, আমাকে থাকতে বললে তোমার সঙ্গে। একসঙ্গে থাকা শুরু করলে। এখন আবার একা হতে চাইছ। বেশ। তাহলে আমরা আলাদা হয় যাই। তবে আমি কিন্তু একসঙ্গে থাকার প্রস্তাবটা দিয়েছিলাম না, এবারেও তুমিই বিপরীত প্রস্তাব দিলে।’’

এখন ওর মনে হচ্ছে একথা বলার পর ওর আর কিছু বলার থাকত না। কারণ কথাটা সত্য।

একবছর আগে কলেজস্ট্রিটে ওর সঙ্গে দীর্ঘ বারো বছর পরে অনিরুদ্ধর দেখা হওয়ার পর খুব দ্রুত সিদ্ধান্তে এসেছিল ওরা। অনিরুদ্ধ ওর কলেজের বন্ধু। একসঙ্গে গ্র্যাজুয়েশন করেছিল ওরা। ঘনিষ্টতা ছিল, তবে প্রেম নয়। বন্ধুর মতোই। পাস করার পরও সম্পর্ক ছিল। রিমি এম এ-তে ভর্তি হল। অনিরুদ্ধ দুম করে চলে গেল মুম্বাই। সে সময় রিমি বুঝেছিল বন্ধুত্বকে ছাপিয়ে অন্য একাট গভীর টান ছিল ওর মনের অতলে, যা কখনওই টের পায়নি। অনিরুদ্ধ চলে যাওযার পর সেটা টের পেয়েছিল। তারপর অফিসকলিগের সঙ্গে প্রেম। বিয়ের পিঁড়ি। সন্তানধারণ। গর্ভপাত। স্বামীর মৃত্যু। একের পর এক দুর্ঘটনায় বিপর্যস্ত রিমি। গল্প লেখার শখ ছিল কলেজজীবনে। সেটাকেই পরম মমতায় আঁকড়ে দকেছিল খড়কুটোর মতো। আরে সেই সূত্রেই অবার দেখা হয়ে গেল অনিরুদ্ধর সঙ্গে।

অনিরুদ্ধ মুম্বাইতে গিয়েছিল চিত্রনাট্যকার হবে বলে। কলকতায় এসেছিল বাংলা সিরিয়ালের

কাজে। একটা মেগার কাজ। কলেজস্ট্রিটের পাতিরামে গিয়েছিল পত্রপত্রিকায় গল্পের খোঁজে। সেখানেই দেখা হয়ে গেল রিমির সঙ্গে। তারপর রোজ বাকসো থেকে পুরনো শাড়ি বের করে ন্যাপথলিনের গন্ধ শোঁকার মতো কলেজজীবনের গল্প। রোজ দেখা হওয়া, রোজ রিমিকে বাসে তুলে দেওয়া, বন্ধুদের খুঁজে বের করে আড্ডা দেওয়া। রিমির দুটো গল্প নিয়েছিল অনিরুদ্ধ। পরিচালকের সঙ্গে আলাপও করিয়ে দিয়ছিল। রিমি বুঝতে পারছিল ওর জীবনের ভালো-মন্দের সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে অনিরুদ্ধ। সব কাজ ও অকাজের কথা বলতে ইচ্ছ করে তাকেই।

একদিন রাতে বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে হঠাৎই ওর মনে হয়েছিল, ওরা তো একসঙ্গে থাকতে পারে। রোজ এভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া। আবার পরেরদিনের জন্য অপেক্ষা। মনে হওয়াটা ছিল বিদ্যুৎ চমকের মতোই। বাড়ি ফেরা পর্যন্ত যেটুকু সময়, তারমধ্যেই রিমি সিদ্ধান্তে এসেছিল।

পরেরদিন ফোনেই কথাটা বলল রিমি,''অনি, ভাবছিলাম, আমরা তো একসঙ্গে থাকতে পারি, তাই না?''

অনিরুদ্ধ সঙ্গে উত্তর দেয়নি। দিতে পারিনি। এইরকম একটা প্রস্তাব যে আসতে পরে রিমির কাছ থেকে তা ওর ভাবনার একেবারে বাইরে ছিল। সে কথা পরে বলেছিল অনিরুদ্ধ। খাকিক্ষণ নীরব থাকার পর বলেছিল,''কথাটা ভেবে বলছ, নাকি এমনিই বলছ। মানে, ইয়ার্কি করছ।''

ও বলেছিল,''তোমার মনে হয় না?''

---''মনে হয় না বলব না। ভেবেছি কখনও। তবে তোমাকে বলা সমীচিন হবে কি না বুজতে পারিনি।''

---''কেন?''

---''তুমি কী ততটা আধুনিক? মানে, যাকে লিভ টুগেদার বলে, সেটাতে রাজি হবে?''

----''কতটা আধুনিক হলে লিভ টুগেদার করা যায়?''

---''তাহলে আমার একসঙ্গে থাকতে পারি। মানে তুমি ততটাই আধুনিক।''

ওপ্রান্তে হেসে উঠেছিল রিমি। তবুও অনিরুদ্ধ বলেছিল, ''সময় নাও রিমি। অকটু ভাবো।''

সময় নেয়নি রিমি।। এই ফ্ল্যাটেই ধরে নিয়ে এসেছিল অনিরুদ্ধকে। থাকা শুরু হয়েছিল একসঙ্গে । এই ফ্ল্যাটটা রিমি অফিস লোনে কিনে শ্বশুরবাড়ি থেকে চলে এসেছিল, একা। স্বাধীনভাবে থাকয় বিশ্বাসী ও তখন। কিন্তু অনিরুদ্ধ এসে ওর বিশ্বাসে টাল ধরিয়ে দিয়েছিল।ও আবার পেন হাতে নেয়।

'তুমি হয়ত অপমানিত বোধ করছ। কারণ আমিই তোমাকে এই বাড়িতে নিয়ে এসেছিলাম ক'মাস আগে। আবার এখন বলছি একা থাকতে চাই। এটাকে আমার খামখেয়ালিপনা ভাবছ তুমি। কিন্তু আমার যা মনে হয়েছে তা তো তোমাকে জানাতে হবেই। তাই না? আমি নিজেই নিজেকে চিনতে পারি না। না হলে কেন তোমাকে বললাম আমার সঙ্গে থাকতে? আমার কি সত্যিই একটা সঙ্গের দরকার ছিল? এসব প্রশ্ন নিজেকেই করছি। আসলে আমার যেটা মনে হচ্ছে সেটা বলতে চাইছি। প্লি-জ, অনি, তুমি আমাকে ঠিকঠাক বোঝো। একাই থাকতে চাইতাম, একা থাকব বলে এই ফ্ল্যাট কিনে চলে আসা। কিন্তু তোমকে দেখার পর আবার তোমাকে পাশে পাওয়ার কী ভীষণ ইচ্ছা জেগেছিল, তা তুমি বুঝেছ। কিন্তু এখন কেন যে আবার ফিরে যেতে ইচ্ছ করছে।

তুমি কোনও কিছু আমার ওপর চাপিয়ে দাওনি। তোমার কোনও দাবি নেই, শর্ত নেই। তবুও একটা অদৃশ্য বাঁধন যেন আমাকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে রেখেছে। আমার একটু একটু করে দম বন্ধ হয়ে আসছে। এটা যে কী দুঃসহ! আমি জানি তুমি আমার এই সমস্যাটা বুঝবে।'

রিমি

অনিরুদ্ধ ঘুমোচ্ছে। আজ শুটিং নেই। শুটিং না থাকলে ও অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমোয়। তারপর সারাদিন স্ি(প্ট লেখে। রিমি চুপচাপ খাওয়া সেরে জলের জগের নিচে চিঠিটা চাপা দিয়ে বেরিয়ে এল। দরজার বাইরে পা দিয়েই নিজেকে হালকা মেঘের মতো মনে হল। ও উড়তে উড়তে বিষাদ ভুলে গেল।

একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরল রিমি। অনির সঙ্গে কথা বলার জন্য ব্যাকুলতায় তাড়াতাড়ি ফেরা। দরজায় তালা। অনি বেরিয়েছে। ও ভেতরে ঢুকে ডাইনিং-এর আলো জ্বালালো। টেবিলের উপরে জগের নিচে ঠিক সেভাবেই একটা হলুদ কাগজ রাখা। ওটা অনিরুদ্ধর প্যাডের কাগজ। রিমি ব্যাগটা না রেখেই দ্রুত চলে গেল টেবিলের সামনে। নিঃশ্বাস বন্ধ করে কাগজটার ভাঁজ খুলল। মাত্র দুটি বাক্য। 'যদি কোনও কাজে দরকার মনে হয়, বলতে দ্বিধা করো না। আমি আসব।'

একটি মাত্র ঘর। সে ঘরে ঢুকে আলো জ্বালল রিমি। কোথাও অনির কোনও জিনিসের চিহ্ন নেই। সত্যিই চলে গেছে। সত্যি চলেই গেল! কোনও অভিযোগ, অভিমান, রাগ না রেখেই চলে গেল? তাহলে তো ওর খুশি হওয়ার কথা। কিন্তু তা কেন হচ্ছে না? কেন কান্না পাচ্ছে। একটা শূণ্যতা কেন ছুটে আসছে ওর দিকে? এই প্রথম একা হয়ে ভয় পাচ্ছে রিমি। তীব্র ভয় ওকে ছুটিয়ে নিয়ে যায় টোলিফোনের দিকে।

'মানুষের প্রিয়তম সম্পদ তার জীবন, এটা সে একবারই পায় এবং এই জীবন, তাকে এমনভাবে কাটাতে হবে যাতে কেটে যাওয়া বছরগুলি সম্পর্কে যন্ত্রণাদায়ক দুঃখের অনুভূতি না জাগে, অতীতের হীনতা ও তুচ্ছতার লজ্জা যেন তুষের আগুনের মত না পোড়ায়, এমনভাবে বাঁচতে হবে যাতে মরার সময় সে বলতে পারে ঃ আমার গোটা জীবন, আমার সমস্ত শক্তি আমি উৎসর্গ করেছি জগতের মহত্তম লক্ষ্যে — মানব জাতির মুক্তির জন্যে — সংগ্রামের লক্ষ্যে।'

— নিকোলাই অস্ত্রোভস্কি

তাপস রায়

একটি ব্যক্তিগত গদ্য

এখন রাত দুটো। মায়ের পাশে বসে আছি। চারদিক বড় নিস্তব্ধ। আর কিছু পরেই প্রথম বর্ধমান লোকাল চলে যাবে। আরো অনেক পরে পাড়ার কুকুরগুলো চিৎকার করবে। ঘন কুয়াশায় প্রথম সূর্যের রোদ আসতে দেরি হবে। কিছুই করার নেই, এমনই একটি রাজ্যে আমি বাস করি।

মা এখন গভীর ঘুমে মগ্ন। সরু লালপাড় শাড়ি শরীরে। চোখে চশমা নেই। মায়ের কপালের উপর কয়েকটা চুল গড়িয়ে পরেছে। হাত বাড়িয়ে সরিয়ে দিলাম সেগুলিকে যত্ন করে। শরীরটা অদ্ভুত ঠাণ্ডা। মুখের দিকে বহুক্ষণ তাকিয়ে দেখি মা যেন আমাকেই দেখছে। দৃষ্টি স্থির। মা তো আমার এমনই। ছোটবেলাতে আমার কোনো দুষ্টুমিতে মা শুধু স্থির চোখে আমার দিকে তাকাত। আমার বুঝতে অসুবিধা হত না মায়ের মৃদু ভর্ৎসনা। আমি মায়ের গায়ে একটা মিষ্টি গন্ধ পেতাম। যেন কোন সুগন্ধি ফুল যা আমাকে নির্ভয় দেয়।

মা জন্মেছিল ১৯৪১-এ। বিবাহ হয়েছিল ১৯৬২ সালে। জন্মসালে নেতাজি ভারতবর্ষ ত্যাগ করেছিলেন আর বিবাহ বৎসরে চিন ভারতকে আক্রমণ করেছিল। আজ যারা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রাস্তায় মহামিছিলের আয়োজন করেছে তারা এই দু'টি ক্ষেত্রেই বিরুদ্ধপক্ষ নিয়েছিল। আজ রাস্তায় গাড়ি-ঘোড়া কম চলবে।

গত চার-পাঁচ দিন অত্যধিক ব্যস্ততার জন্য নিজেকে পরিস্কার রাখা হয় নি। এমন কি দাড়িটাও কাটা হয়নি। একটু পরে বাইরে গিয়ে দাড়ি কেটে আসব। মা পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা পছন্দ করে। মায়ের জন্য আলমারি থেকে পরিস্কার শাড়ি-ব্লাউজ বের করে রেখেছি। ওরা সকলে আসলে পরিয়ে দেবে। চা বানাতে হবে। আজ এককাপ বসালেই হবে। আজ মা চা খাবে না। পান খাবে না। জলও খাবে না।

আমার মা গান গাইতে পারত খুব ভাল। দাদু রোজ সন্ধ্যায় আমাদের বাড়িতে লোক ডেকে আনতেন মায়ের গান শোনাবার জন্য। মা মহাত্মা গান্ধির ভক্ত ছিল। বলত, তোরা বয়স হলে বুঝবি গান্ধি কত বড় মানুষ ছিলেন। কত ত্যাগ। সিনেমায় মায়ের হিরো ছিলেন ছবি বিশ্বাস। মা আমাকে একবারই কান ধরে শাসন করেছিল। সেবার আমি ঘর ভর্তি মানুষের সামনে মিথ্যা কথা বলেছিলাম। রাতে দুজনে পাশাপাশি শুয়ে এক বই থেকে সুকুমার রায়, লীলা মজুমদার, বিভূতিভূষন পড়তাম, আলাদা আলাদা ভাবে। মা বলত, যে শিশু সাহিত্য না ভালবাসে সে পরিপূর্ণ মানুষ হতে পারবে না কখনও।

তিমিরকে খবর দিইনি এখনও। বিরক্ত করতে চাইনি। কাজ সেরে অনেক রাতে বাড়ি ফেরে। সকালের চা-জলখাবার, খবরের কাগজ শেষ করুক আগে। গত পাঁচ বছর আসেনি। আর তিমির আসেনি বলে কোয়েল আর ওদের একমাত্র ছেলে ঋকও আসেনি এতদিন। আমাদের একমাত্র বোন সুচিত্রা, ওর আবার আজই শিশির মঞ্চে গানের প্রোগ্রাম। ওকেও এমন সময় বিপর্যস্ত করা ঠিক হবে না। কনসেনট্রেসনের অসুবিধা হবে।

হিসাব করে দেখেছি চারজন লোক দরকার। ওঠানো-নামানোর জন্য চারজন চারদিকে আর আমি পিছন পিছন। লোকনাথ সেবাশ্রমকে খবর দিয়েছি। গাড়ির সঙ্গে হেলপার, ড্রাইভার ছাড়া আরো দুজন এক্সট্রা লোক পাঠাতে বলেছি।

চল্লিশ বছর আগে আমাদের দুটো শরীর এক ছিল। সেই শরীরটা এখনও আমার সামনে। এই শরীরে এখন আর আমার মা নেই। ঠিক বললাম তো? নাকি এখনও তার প্রতিভাসটুকু আছে এই শরীরে। মা কি তার প্রাণ-সংস্কার সুক্ষ্মাকারে ধারণ করে চলে গেল অন্য কোথাও!

হঠাৎ ভীষণ গরম অনুভূত হচ্ছে আমার। গায়ের পাঞ্জাবীটা লেপ্টে ধরেছে আমার সারা শরীরকে। হঠাৎ করে লোডশেডিং হয়ে গেল। এখন যদি শ্মশানেও লোডশেডিং থাকে? সবার সামনে মাকে শুইয়ে রাখতে আমার কষ্ট হবে। মায়ের শরীর থেকেই তো আমার এই শরীর। আমার শরীরেও তো মা আছে। আমার সত্যি সত্যিই ভালো লাগবে না। আমি যতদিন বেঁচে থাকব আমার মা-ওতো বেঁচে থাকবে ততদিন আমার এই শরীরে। কেবল শরীরেই বা কেন। আমার বোধে, আমার চৈতন্যে, আমার অস্তিত্বেও।

বাইরে গাড়ির হর্ন। ওরা এসে পড়ল। চলো মা এবার বেড়িয়ে পরা যাক। মা তুমি যে ফুল ভালবাসতে তা আমি একদম ভুলে গিয়েছিলেম। দ্যাখো, ওরা কিন্তু চারজন চারটে ফুলের মালা নিয়ে এসেছে তোমার জন্য। তারমধ্যে একটা আবার তোমার সবথেকে প্রিয় বেলিফুলের মালা। ওরা তোমাকে সাজিয়ে দেবে। কে বলে দিল ওদের এমন কথা? ওদের স্নায়ুতে স্নায়ুতে ওদের মায়েরাও কি বলেছিল তাদের এক বোনের জন্য ফুল আনতে! নাকি অনেক মা নয়, ভুবনজোড়া একটিই মা।

মা তুমি তো পাহাড় আর নদী ভালবাসতে। অসুস্থ হবার পর আমার কাছে আব্দার করতে, এবার সুস্থ হলে একবার বাইরে নিয়ে যাবার জন্য। তোমার গলায় রজনীকান্ত, রবীন্দ্রনাথ শুনলে আমি সমস্ত দুষ্টুমি ছেড়ে চুপ করে যেতাম, এতো তোমার কথা মা! বাইরের খোলা হাওয়ায় তোমার গলাও যেন প্রকৃতির সঙ্গে প্রেম করত! সে এক রোমাঞ্চকর স্মৃতি মা আমার কাছে। আসলে জন্মাবধি জ্ঞান হওয়ার পর বাবাকে তো দেখিনি। তুমি বলতে, আমার মধ্যে একটু একটু করে বাবাকে খুঁজে পেতে।

শ্মশানে তুমি মাত্র একজনের পরেই। এখানেও তোমাকে অপেক্ষার লাইনে বেশিক্ষণ দাঁড় করালোনা কেউ। আর কিছু পরেই তুমি ছাই হয়ে মিশে যাবে এই জগৎ সংসারে। আমার মনে হয় তুমি একদম পুড়বে না। শেষ হবে না তুমি। দেখো, কিছু একটা অবশিষ্ট তোমার, থেকে যাবে আমার কাছে। এখন এই নিঃঝুম শেষ দরিয়ায় একমাত্র আমিই তো তোমার সঙ্গী। তুমি পারবে না আমাকে একা রেখে যেতে। তোমার তো কষ্ট হবে মা। আমি জানি! তুমি আড়ালে গিয়ে কান্নায় লুটিয়ে পড়বে আমারই জন্য। এই না হলে তুমি আমার মা।

একটি মাঝ বয়সী ছেলে এসে আমার হাতে একপিণ্ড কাদা তুলে দিয়ে বলল, এইটা জলে ফেলে স্নান সেরে বাড়ি ফিরে যেও।

জলের কিনারে কাদার পিণ্ডটা নিয়ে দাঁড়াতেই মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হল। আমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। আস্তে আস্তে আমার হাতের কাদার পিণ্ডটি গলে যেতে থাকল, বৃষ্টি আমাকেও ধুয়ে দিল সমস্ত শরীরে। আমার মনে মা যেন চীরজীবনের মত প্রথিত হয়ে রইল। মা তোমার মধ্যেও কি আমার সামান্য একটুখানি অবশিষ্ট রইল না? তোমার শোনিত ধারায়, তোমার স্নায়ুতেই তো আমার অস্তিত্ব থেকে গেল মা সারাটা জীবন। আমিতো বাইরে বেড়েছি, আমার চিহ্নও কি থেকে গেল না তোমার ভিতরে?

যাওয়ার সময় সঙ্গে মা ছিল। এখন ঘরের দিকে ফিরে আসতে গিয়ে দেখি আমি একদম একা। প্রত্যয় হল, সমস্ত সৃষ্টি জুড়ে এক অখণ্ড মাতৃতত্ব আছে, যা ব্রহ্মতত্বের মত অণির্বান, অনিরুদ্ধ। মাতৃত্বের কোনও ঘর নেই, মৃত্যু নেই। মৃত্যু নেই কখনও কোনও মায়েরই। এই বৃষ্টি, এই হাওয়া, এই একলা পথ চলা সবই যেন আমাদের সকলের মায়ের সঙ্গীত।

একলা ঘরে এই প্রথম কাঁদলাম আমি, মায়ের ছবির সামনে নতজানু হয়ে। তুমি মরে গেছ বলে কাঁদছি না মা আমি। তুমি কখনও মরতে পারো না বলে কান্না এল। এই জল দিয়ে এসো মা তোমার চরণ ধুয়ে দিই।

যশোধরা রায়চৌধুরী

রূপদক্ষ

১.
ভৌতিক মন্দিরশিল্প। কর্মপ্রবচনে হেরে যাওয়া।
আমাকে কথার প্যাঁচে কষ্ট দেয় মূঢ়তার দিন।
তারপর অপার শিল্প। আর স্পষ্ট বেঁচে থাকা, লোভ তার বড়
আবার ফিরেছি আমি কাজহীন প্রলয়গর্জনে।
ভৌতিক নির্মাণশিল্প। নিন্দাপ্রবচনে নিভে যাওয়া।

২.
ভুলে যাওয়া প্র্যাকটিস করেছি।
দিন যায় দর্পণ প্রেক্ষণে।
আজো ভাবি, অমানিশা নয়
পূর্ণিমাই আমার মুকুল।

অথচ সমস্ত যায় নীলে।
ঝরে যায় অঙ্কুরিত হুল।

৩.
বিষাদের হর্মোন চষেছি।
আকুলতা দেখিয়েছি, ভুলে
কাতর ও হতাশ্বাসভাবে
পুনরায় বসেছি তো এ ডালে, ও ডালে

একদিন হবে গুরুতর
খবর এ ধরিত্রী-কপালে
লিখে দিলে অনুতাপবোধ

আমি ও আমার ঋণশোধ।

সোনালি বেগম

মুক্তিসন্ধানে

হৃদয় ভেঙে যায়। ধৈর্য ক্ষমা সত্য আর শান্তির রণক্ষেত্রে
তুমি কি একা! টলটল জল পদ্মফুল ও পাতায়। জীবন-মৃত্যুর
ঝরনাধারায় সবুজ পাতা আরো উজ্জ্বলতা পায়। আশীর্বাদ প্রাপ্ত
চলমান শিল্পে গড়ে ওঠে অসংখ্য ভাস্কর্য। সময় ও স্থান
অধিকারে অবিচল অস্তিত্ব। মুক্তিসন্ধানে উল্লেখযোগ্য অগ্রসর
ও খোঁজ। সুযোগসুবিধায় মানসিক বিকাশ জরুরি। মন তো বস্তুসার
নয়। জাগ্রত প্রদীপের উৎসর্গীকৃত প্রবাহিত হৃদয় মাটির পরতে
বিলীন হতে থাকে...

বিশাল ভদ্র / পরখের চাবি

কিছু কিছু প্রশ্ন যার উত্তর প্রশ্নকর্তার মনের মত না হলে
উত্তরদাতা খারাপ হয়ে যায়, নষ্ট হয় পোষা ধারণা —
‘যা ভাবতাম, লোকটাতো তা নয়। কেমন যেন ট্যারা
ফট্ কোরে মুখের উপর বলে দিল!’ আমরা কিন্তু বলি না
সরিসৃপটা লুকিয়ে রাখি। না রাখলে কাছের মানুষ সন্দেহ।
যদিও কোনো অভিধানে ‘কাছের’ বলে শব্দটার যথাযথ অর্থ
দেয়া নেই। জানার জন্য বেশি খুঁজলে সিন্দুকে থরে থরে সাজানো
কঙ্কমাল পোকারা বাইরে এসে ছড়িয়ে দেয় গভীরতর আতঙ্ক।
একটা প্রশ্নের বহু উত্তর সঠিক কোনটা পরখের চাবি ঘোরালে
আশেপাশের সব সত্যি সরে সরে যায় কাছের থেকে দূরে ...

সংহিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

দিকভুল

আমাকে দেখাও পথ কোনো
কিভাবে আরো একটুখানি
তোমাদের পাশে রয়ে যেতে পারি —

সারাদিন আগুন তুলেছি
খুঁড়ে খুঁড়ে স্তব্ধ দাগ থেকে
ফুঁ দিয়ে উড়িয়েছি গুঁড়ো গুঁড়ো, ঝলক ঝলক...

উড়িয়েছি বেড়ে ওঠা কান্নার দিকেই —
শহরের মাথার ওপর
ভারী মেঘের মতো থমকে আছেই যে

ক্রমশ রাত্রির দিকে ফিরেছি যখন
ঘুমের বদলে কেন নির্জন প্রহর?
আমাকে একলা পেলে —

সাজানো স্বপ্নের দিকে তাড়া করে আসে
সময়ের দাঁত

স্বপন বক্সী

অন্য এক পৃথিবীতে

হৃদয়ে লুকিয়ে থাকা
ইচ্ছেগুলো
মন বলাকার পাখায়
ভর করে
হারিয়ে যেতে চায় ...
গাঢ় নীল, ঘন সবুজে
অন্য এক পৃথিবীতে।

সুমিত চট্টোপাধ্যায়

সে আসবে

বসে আছি স্থির দক্ষিণের জানালায় — সে আসবে।
আমার যে-যাত্রা পুবমুখো পথে পথে, জলে-জঙ্গলে-পাহাড়ে
গতিমুখ পাল্টে এখন দক্ষিণায়ন — তন্ময় দৃষ্টির ভ্রমে?— সে তো সূর্য-অভিরুচি।
'যেও না, যেও না ভাই, দক্ষিণ দুয়ারে'— এ কেমন শে-াক বলো!
সারি সারি মুখ স্মৃতির সরনি বেয়ে আমাকে পোড়ায় জ্বালায় ভাবায়।
শঙ্খধ্বনি শুনি, বিষাদের গানসহ, প্রদীপের আলো জ্বলে মিটিমিটি
মৃত্যুর বিরোধী এও এক উৎসব, জন্মদাগে রক্ততাপে।
'আত্মা' 'আত্মা' বলে এসেছিলো কাছে যারা, তার আজ দূরে দূরে
আহত বিক্ষত রুক্ষ শঠ অভিমানী — আমাকে ছেড়েছে, আমিও হয়তো।
আশ্রয়হীনের ফিরে আসা, সেখানেও ঘুণপোকা — ক্ষয় ক্ষয় ক্ষয়রোগ
আগুন লেগেছে কোনখানে বোঝা যায় — ভালোবাসা খোঁজা শুধু।
পশ্চিম আকাশে ভয়ঙ্কর রক্তমেঘ, উত্তুরে বাতাস নিয়ে
বসে আছি স্থির দক্ষিণের জানালায় — সে আসবে। আসবেই।

কণিকা চট্টরাজ

উড়াল

একটি গল্প উড়ে যায় মেঘবাড়ির দিকে
বন্ধু পাখিরা ছায়ার মতো ঝাঁক বেঁধে
উড়তে থাকে মাথায় মাথায়
নীচে পড়ে থাকে সংসারের গন্ধমাখা বাড়িঘর
ব্যাক সাইড থেকে একটি ছবি
একটি ছবি সামনে আলো ফেলে
মনভাসি রচনাগুলো ছেঁকে নিয়ে
অপূর্ব কোলাজ!
ঘুমন্ত মাথা থেকে টুপিটি নেমে
অভিবাদন জানায় নামতাপড়া সকালকে
কাকলিমুখর পাখিরা প্রত্যেকে
ডানা বদল করে অনন্য উড়াল দেয়
অন্য মহাকাশে...

দেবাশিস চট্টোপাধ্যায়

অপরূপ কথা এবং ছেলেবেলার ঘুড়ি

শৈশবের উজ্জ্বল পোশাক হারিয়ে ফেলে ঘুরে বেড়াচ্ছি কতদিন
অপরূপ একটি কথার জন্যে(চলাচলের যেসব পথ, তাদের
সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতে গিয়ে দেখি তারা নিজেরাই গন্তব্যহীন
তাদের কোনও কথাই নেই(তাহলে এই যে এত উচ্চারণ, এত
স্পর্ধার ঘনঘন বেজে ওঠা, কী জন্যে? কী জন্যে রাত্রির
নিস্তব্ধ নখ বিঁধে যায় পৃথিবীর শরীরে, আর সেই
নখের আঘাত জনিত ক্ষত থেকে ফোয়ারার মতো কান্না
উঠে ছড়িয়ে পড়ে আকাশে(তারার সূর্যোদয় এবং আলোর
উদ্ভাস সেই কান্নাদের প-াস্টিক সার্জারি করে সাজিয়ে
গুছিয়ে ফেরৎ পাঠায় আমাদের ঠোঁঠে(সেই থেকে

কথা শুনতে শুনতে ক্লান্ত হয় রোদ্দুর, ক্লান্ত হয় ইস্কুল
অফিস, আদালত ও নিভৃতের ঝর্ণা(আমরাও ঢুকে পড়ি
অসহায় জীবনের ভেতর(পরিচর্যাহীন শৈশব মনে পড়ে
মনে পড়ে রোমাঞ্চকর স্পর্শ ও অসামান্য প্রতিভায় অচেনা
রাস্তাদের বলা তোমরা আমাকে কিছুতেই হারাতে পারবে না

সকাল পেরিয়ে যে রাত্রি নামে ম্যাজিক প্রতিভায় তার দিকে
কেউ কেউ হয়তো ঘুমোবার আগে তাকায়, ভাবে আজ হয়তো
একদিনের ভ্রমণ থামবে(আজ হয়তো শুনতে পাব অপরূপ
কথা, যার ভেতর উড়তে থাকবে ছেলেবেলার ঘুড়ি

সুবীর ঘোষ

বীজ বুনলেই জল দিতে হয়

এক পা যখন
সাগর ডিঙোয়
তখন অন্য পা-টি
বলে — আমার মায়ের নাম
বদ্দমানের মাটি।

ছাতিমগাছে মশলা এবং
বাঘের গায়ে জরি
এই ঘোড়াতে কবে থেকে
তোমার হাতে খড়ি?

বীজ বুনলেই জল দিতে হয়
পতনদৃশ্যে ঘুম
কুশীলবের মাথার ওপর
ডিম পাড়বার ধূম।

তা দিও না গরম পাখি
বঁটির ওপর বোসো
একটি টাকার সুদের হিসেব
আঁটির মতন চোষো।

কানাইলাল জানা / জন্ম এবং জন্ম

প্রতিদিন আমি নতুন করে জন্মাই
মেঘ থেকে জন্মাই, মরু থেকে জন্মাই
উচিৎ থেকে জন্মাই, উপমা থেকে জন্মাই
বৈশাখ থেকে জন্মাই, বিপাশা থেকে জন্মাই
পাতাবাহার থেকে জন্মাই, পাথরকুচি থেকে জন্মাই
রোববার থেকে জন্মাই, রাহু থেকে জন্মাই
পরিস্থিতি থেকে জন্মাই, পাণ্ডুলিপি থেকে জন্মাই
ব্ল্যাকহোল থেকে জন্মাই, বিলাপ থেকে জন্মাই...

আবার শ্মাশান থেকে যেমন জন্মাই সরোবর থেকেও
ধারাপাত থেকে যেমন জন্মাই ধ্রুবতারা থেকেও
ঘেরাটোপ থেকে যেমন জন্মাই ঘুঘু ডাক থেকেও
শেষপৃষ্ঠা থেকে যেমন জন্মাই সালতামামি থেকেও
গুবরেপোকা থেকে যেমন জন্মাই গুলতানি থেকেও
ছায়াপথ থেকে যেমন জন্মাই ছন্দপতন থেকেও
এতবার জন্মাই যে গুনে শেষ করতে পারিনা
যখন পারি তার থেকেও আরো একবার জন্মাই...

তাপস সরদার

রাত গড়িয়ে চলে

শীত চলে গেছে বাতাসে উষ(তা ভেসে ওঠে
নির্মীয়মান সেতু রেসের মাঠ রবীন্দ্রসদনের আলোয়
একা রবি ঠাকুর আর তাঁবুতে কাজের লোক
চুলো জ্বলে
গভীর রাতে ভাত ফুটছে

কোনোএক নীলকণ্ঠ পাখি এসে বসলো ল্যাম্প পোস্টে

অনেকদিন তার গান শোনা যায়নি
এবার হয়তো ডেকে উঠবে
ভাবতে ভাবতে ভাবতে ভাবতে রাত গড়িয়ে চলে

ঈশিতা রায়

ভাঙনের পরে

ভাঙনের পরে দেখা হবে তোমার
আমার
ভাঙনের পরে কী আছে!
সেটা এখন শুধুই দেখার
খাদের সামনে দাঁড়িয়ে আমি
কই মৃত্যু ভয়তো আসছে না
বেঁচে থাকা এখন কেবল যাতনা
ঘুম আয়
মৃত্যু আয়
নিয়ে যা আমায়
অচিন দুরে কে যেন তারা চেনায়
বশিষ্ঠ, মরিচী, অঙ্গিরা
ওই দ্যাখ্ কত তারা
আমিও তারা হব,
আমিও চলে যাব
আর তারপর —
অনেক উঁচুতে, আকাশে উঠে
তুমি যখন তারা চেনাবে
তোমার সন্তানকে,
স্ত্রীকে বলবে ‘এদিকে এসো’
আমি তখন বলব, ‘ওকদের
ভালবেস’।
অবশ্যই দ্যাখা হবে তোমার আমার
ভাঙনের পরে ...

রথীন কর

এই সব ভাষা

যে ভাষা শিশুর অধরে
যে ভাষা প্রথম প্রেমের চোখে
যে ভাষা শঙ্খস্তনী নারীব
বুকের ভিতরে
সে ভাষা কি পড়তে পারো কবি?

তুমি কি জানো কোন সংগোপনে
কুণ্ঠিত কোরক
রূপময় শতদল হয়ে ওঠে।
তুমি কি জানো
সূর্যের সাতটি অশ্ব
কোন রসায়নে আকাশকে
নীল হতে ডাকে?

তুমি কি জানো
কোন উড়াল পাখি মধ্যদুপুরে
সেই নীল ভেঙে কিছু
কথা এঁকে যায়
চেতনার চিত্রপটে?

এইসব মননের ভাষা
এইসব রূপময় শব্দ —
তুমি কি পারো আবার বৃত্তে সাজাতে?

খলিল জিব্রানের 'শয়তান'
ভাবান্তর ঃ খোন্দকার ফয়জুল আলিম

সামান একজন ধর্মযাজক, লেবাননের দক্ষিণে তার বাস। ধর্মযাজক হিসাবে মানুষের অভিভাবক — 'ফাদার'। ধর্মীয় বিষয়ে তার গভীর দখল, মানুষের কোন কোন পাপের ক্ষমা পাওয়ার আশা আছে আর কোন কোন পাপের ক্ষমা পাওয়ার আশা নেই, সেই সব ক্ষমাশীল ও ক্ষমাহীন পাপের ব্যপারে তার গভীর জ্ঞান। মৃত্যুর পর যে স্থানে মানুষের পার্থিব কাজের বিচার হয় এবং তারপর কিভাবে মানুষের স্বর্গ বা নরকে স্থান হয় তার বিবরণ দ্বিধাহীন ভাবে ফাদার বর্ণনা করে দেন। মানুষ মুগ্ধ হয়, ধর্মীয় বিষয়ে ফাদারকে অভিভাবক বলে মানে।

এক বসতি থেকে অন্য বসতিতে নিজের ধর্ম প্রচার করা ফাদারের অভ্যাস, তার উদ্দেশ্য মানুষের মনে পাপের যে বীজ পোঁতা আছে তাকে তুলে ফেলা, মানুষ যেন শয়তান ফাঁদে পড়ে নিজের সর্বনাশ না করে।

মানুষ তাকে সম্মান করে, কাজের ব্যাপারে উপদেশ চায়। নিজেদের পাপের গোনাহ মাফ হওয়ার জন্য ফাদারকে তাদের হয়ে পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনার অনুরোধ করে। ফাদারের আশীর্বাদ পেলে তারা নিজেদের ধন্য মনে করে। মানুষ ভাবে, ফাদারকে বাদ দিয়ে পরমেশ্বরের কাছে পৌঁছান সম্ভব নয়। ফাদার পরমেশ্বরের সাথে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম। ফাদার নিজেও তাই ভাবে। সকলকে বলে — সবই পরমেশ্বরের করুণা। মানুষ তাদের পরিশ্রমের টাকা-পয়সা, সোনা-দানা দেয়, ফসল তোলার সময় উৎকৃষ্ট ফসল ফাদারের কাছে পৌঁছে দেয়। মানুষ নিজের মত করে তাদের কাজ করে আর ফাদার তাদের কাজের জন্য পরমেশ্বরের কাছে ওকালতি করে। এই ভাবে দিন যায়।

সব জায়গায় ধর্মযাজকদের এক রূপ, একই সুরে তারা কথা বলে। ধর্মের ব্যাপারে মানুষের উপর তাদের সর্বময় আধিপত্য।

ছোট পাহাড় ঘেরা এক নির্জন উপত্যাকার ওপারে এক বসতি। নির্জন উপত্যকায় জপমালা হাতে আপন মনে জপ করতে করতে চলেছে ফাদার। হঠাৎ তার কানে এল কান্নার আওয়াজ। থমকে দাঁড়িয়ে ভালভাবে শুনল ফাদার, তারপর কান্নার আওয়াজ শুনে এগিয়ে গিয়ে দেখল, নালায় পড়ে আছে এক নগ্ন ব্যক্তি। তার মাথায় ও বুকে গভীর ক্ষত, রক্ত বয়ে যাচ্ছে। একজন নগ্ন ব্যক্তি গোঁঙাচ্ছে, 'বাচাও। আমাকে সাহায্য কর। দয়া কর। না হলে আমি মারা যাব।' নির্জনে এই অবস্থায় একজন মানুষকে দেখে বিস্ময় হতবাক ফাদার, কি করতে হবে ভেবে পেল না। তার মনে হল এ নিশ্চয় একজন চোর। পথচারীদের উপর রাহাজানি করতে গিয়ে এই দশা। ফাদার ভয় পেল, লোকটা যদি মরে যায়, সকলে তাকেই এর মৃত্যুর জন্য দায়ি করবে। অন্য কেউ পাছে দেখে ফেলে, ফাদার তাড়াতাড়ি চলা শুরু করল।

তার চলে যাওয়া দেখে করুণ স্বরে মুমূর্ষু লোকটি বলে উঠল,'আমাকে এইভাবে মরার জন্য ফেলে রেখে যেও না।' এই অবস্থায় কাউকে সাহায্য না করে চলে যাওয়া অন্যায়, ফাদার ভাবল।

আবার পরক্ষনেই তার মনে হল, চোর না হলেও এ নিশ্চয় ভবঘুরে পাগল। তাছাড়া আমি মানুষের মনের রোগ সারানর চেষ্টা করি — তুকতাক দিয়ে মুখের কথায় আর নরকের ভয় দেখিয়ে। সুতরাং কি করে এর ক্ষতের চিকিৎসা করব? আমি তো চিকিৎসক নই। ফাদার আবার চলা শুরু করল। এবার লোকটা আগের থেকে আরো করুণভাবে অনুনয় করল,' এসো, কাছে এসে দেখ আমায়। আমরা অনেক দিনের বন্ধু। তুমি ফাদার সামান। মানুষের উপকার করবে বলে ঘুরে বেড়াও। আমি চোর নই, পাগলও নই। এইভাবে নির্জনে মরার জন্য আমাকে ফেলে রেখে যেওনা। আমাকে দেখ। তোমাকে বলব আমার পরিচয়, আমি কে?'

নালার কাছে এসে হাঁটু মুড়ে বসল ফাদার। ভালো করে দেখল লোকটির মুখ, সৌন্দর্য্যের সঙ্গে কদর্যতা, বুদ্ধিমত্তার মধ্যে কুটিলতা, কোমলতার মাঝে নিষ্ঠুরতার মাখামাখি এক বিচিত্র রূপ। এমন রূপ কোনো মানুষের হতে পারে না, ফাদার চমকে উঠল। ফাদারের ভয় পাওয়া বুঝতে পেরে লোকটি বলল, 'ভয় পেয়ো না আমায়, আমরা অনেক দিনের বন্ধু। তুমি আমার পরিচয় জান। বহুদিন ধরে দেখছ আমায়। প্রতিদিন সকলকে আমার কথা বল তুমি। তোমার জীবনের থেকেও আমি তোমার কাছে প্রিয়।'

ফাদার রেগে গেল, 'তুমি মিথ্যাবাদি ভন্ড, মৃত্যুপথযাত্রীর সত্য কথা বল উচিত। আমি চিনি না তোমাকে কখনও দেখেছি বলে মনে হয় না। তুমি নিজের পরিচয় দাও নাহলে তোমাকে এই অবস্থায় ফেলে রেখে যাব।' কনুয়ের উপর ভর দিয়ে লোকটি ওঠার চেষ্টা করল, যন্ত্রনায় কাতরাতে কাতরাতে বলল, 'ভালো করে দেখ। আমরা একই পথের পথিক, আমি না থাকলে তোমারও অস্তিত্ব থাকবে না।' বারবার একই কথায় ফাদারের চিন্তা হল। ফাদারের দোলাচল চিত্ত দেখে মরনাপন্ন লোকটি ভরসা পেল, ফাদারের চোখে চোখ রাখল, তার মুখে ফুটে উঠল রহস্যের হাসি। গুরু গম্ভীর স্বরে বলল, 'আমার পরিচয় জানতে চাও? তবে শোন।' তারপরই অট্টহাস্যে বলে উঠল, 'আমি শয়তান।' তার হাসিতে নির্জন উপত্যকা কেঁপে উঠল, পাহাড়ের প্রতিধ্বনি বলতে লাগল 'আমি শয়তান, আমিই শয়তান।'

'শয়তান' শুনে ফাদার পাথর। তার উপাসনালয়ে টাঙানো শয়তানের ছবি মনে ভাসল, 'দুর্ভাগ্য আমার, জীবনে শয়তানের সঙ্গে চাক্ষুস পরিচয়ও আমার ভাগ্যে ছিল?' ফাদারের মুখে কথা নেই।

'আমাকে দাঁড় করাও বন্ধু, শুশ্রুষা কর।' শয়তানের আবেদনে ফাদার কিছুটা ধাতস্থ হলো, বলে দিল 'যে হাত দিয়ে পরমেশ্বরের উপাসনা করি সেই হাত দিয়ে নরকের পুত-গন্ধ ভরা শরীর ছোঁব না।'

'বন্ধু, ভুল করছ তোমার ধারণা নেই যে তুমি নিজের মনের উপর অত্যাচার করছ,' শয়তান বলল, 'শোন আজকের ঘটনা, এই নির্জনে আমায় একাকী পেয়ে একদল দেবদুত আমাকে আক্রমন করে, তাদের আমি কাবু করে ফেলেছিলাম কেবল একজনের জন্য পারলাম না, তার হাতে ছিল উজ্জ্বল দুমুখ তলোয়ার। সেই আমায় কাবু করে ফেলল। আমি মরার ভান করে মাটিতে শুয়ে না থাকলে শেষ করে দিত।' ফাদার মনে মনে বলল, 'বেশ হোত।' কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর শয়তান জানাল, 'যার হাতে দুমুখ তলোয়ার ছিল, মনে হয় সে মিকাইল।'

ধর্মযোদ্ধা দেবদুত মিকাইলের হাতে শয়তানের পরাজয় হেনস্তার কথা শুনে ফাদারের হাতাশা কাটল, 'যাক ধর্ম বজায় আছে।' আকাশের দিকে মুখ তুলে ফাদার নিবেদন করল, 'ধন্য ধন্য

মিকাইল, আজ আপনি মানবতাকে চরম শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করলেন।'

ফাদারের উল্লাসে, শয়তান রাগে ফেটে পড়ল, 'শয়তানের পরাজয়ে মিকাইলকে ধন্যবাদ? সে কি তোমার বিপদে হাজির হয়! ভেবে দেখ দেখি, আগের মত আজও তোমার মত ফাদারদের সব সুখ-শান্তির উৎসমুখ 'আমি' — এই শয়তান। তোমাদের পার্থিব উন্নতি, মান-সম্ভ্রম, সম্পদ সব কিছু শয়তানের নাম ভাঙিয়ে পাওয়া, তোমরা শয়তানের ছায়ার জন্য খেয়ে পড়ে বাহাল তবিয়েতে আছ। প্রত্যেক কাজে শয়তানের নাম ব্যবহার কর। কাজের অজুহাত হিসাবে শয়তানকে খাড়া কর। অথচ শয়তানের প্রতি তোমাদের শুভেচ্ছা নাই, তার বিপদে সাহায্যের হাত বাড়ানো নেই। শয়তানের অস্তিত্ব থাকলেই বজায় থাকবে তোমাদের প্রভাব- প্রতিপত্তি। শয়তানের বর্তমান-ভবিষ্যৎ ছাড়া তোমাদের বর্তমান নেই, ভবিষ্যতও নেই।'

'এখন বলো ফাদার, তোমার উদ্দেশ্য কি পূরণ হয়েছে? চাহিদামত ধন-সম্পদ চাওয়া-পাওয়া শেষ? না, শয়তানের ভয় দেখিয়ে আরো টাকা-পয়সা, সোনা-দানা পাওয়া অসম্ভব? তোমরা কি চিন্তা কর না, শয়তানের মরণ হলে তোমরাও না খেয়ে মরবে! ভাব দেখি শয়তানের নাম-নিশানা চলে গেলে জীবিকার কি হবে?'

'যুগ যুগ ধরে তোমরা ফাদারের দল হয়ে ঘুরে বেড়াও, মানুষকে ভয় দেখাও 'শয়তানের হাত থেকে বাঁচো' তার বদলে পাও ওদের কষ্টের উপার্জন টাকা-পয়সা, সোনা-দানা, আর জমির ফসল। আজ আমার মরণ হলে, কাল ওদের কার ভয় দেখাবে? তোমাদের কাছ থেকে ওরা কোন উপদেশ কিনবে যখন জানবে ওদের চরম শত্রু শয়তানের নাম-নিশানা নেই। আমার মরার সাথে সাথে তোমাদের ফাদারজীবিকাও থাকবে না, পাপের গোনাহ থেকে সবাই বাঁচবে। ফাদার হিসাবে তোমার কি ধারণা হয়নি, শয়তানের অস্তিত্ব আছে বলে উপাসনালয়ে স্থান তার শত্রুদের। চিরাচরিত এই বিরোধ/শত্রুতা সেই গোপন হাত, যে হাত বিশ্বাসীদের পকেট শূন্য করে ভর্তি করে দেয় ধর্মযাজকদের পকেট।'

'ফাদার, তুমি যদি আজ আমায় মরতে দাও তাহলে তোমাদের সকলেন মান-সম্মান, জীবন-জীবিকা, বাড়ি-ঘর, সম্পত্তি সব শূন্যে মিলিয়ে যাবে।'

শয়তান এবার চুপ করল, হাঁফ নিল, এখন তার মনের সাহস বেড়েছে, সে আবার শুরু করল, 'ফাদার তুমি জ্ঞানের অহংকারে গর্বিত অথচ আসল সত্য বোঝ না, জান না। এসো তোমাকে শোনাই ধর্ম-বিশ্বাসের ইতিহাস। তুমি নিজে বুঝতে পারবে তোমার-আমার মধ্যের বন্ধন, যে বন্ধন আমাদের উভয়ের বেঁচে থাকার শর্ত।

ঘুম ভেঙে মানুষ যখন আলোয় ভরা পৃথিবীকে প্রথম দেখল তখন দুহাত তুলে বলে উঠল 'ওই আকাশের ওপারে দয়াময় ও প্রেমময় পরমেশ্বরের বাস।' সেই আলোয় আবার যখন নিজের ছায়া দেখল, হায় হায় করে উঠল, 'এই মাটির নিচে আছে শয়তান — যে কেবল ভালবাসে ছলনা, বঞ্চনা, লোভ।' আলো-আঁধার এই দুই শক্তির মাঝে আমার বসবাস। একজনের কাছে আমার আশ্রয় অন্যজনের সঙ্গে আমার বেঁচে থাকার লড়াই।' নিজের মনে বলতে বলতে মানুষ নিজের গুহায় ফিরে গেল। মিছিলের মতো সময় বয়ে যায়, এই দুই শক্তির মধ্যে মানুষ বেঁচে থাকে। একজন পায় মানুষের উৎসর্গ নিবেদন, কারণ সে তার উন্নতি ঘটায় আর একজন অভিশপ্ত কারণ সে মানুষকে ভয় দেখায়। আশীর্বাদ আর অভিশাপের গভীর তাৎপর্য মানুষ বোঝে না, আলো-

আঁধারের মাঝে জীবনযাপনকে ভাবে গ্রীষ্ম- বর্ষার ফলেফুলে ভরা গাছ, আর শীতকালে পাতাঝরা শূন্যতা।

মানুষের চিন্তা ভাবনা/বিবেচনার শুরু সংসার জীবন/গার্হস্থ জীবন আরম্ভ হওয়ার পর। পরিবার এল, গোত্র তৈরি হল, জ্ঞান ও কর্মদক্ষতার ভিত্তিতে শ্রমের বিভাজন হল। একদল জমি চাষ করল, একদল ঘর তৈরি করল, একদল কাপড় বুনল, একদল শিকার করে খাবার আনল — ভালো আর মন্দের পার্থক্য করল, ভালোকে বলল পূণ্য আর মন্দকে পাপ। মানুষের ধর্ম হল 'ভালো'। মানুষের ধর্মভাবকে একদল জীবিকার পুঁজি করল। ধর্ম হল জীবিকার এক উপায় মাত্র।

মুহূর্তে জন্য শয়তান থামল, অকারণে হেসে উঠল, তার হাসি এখন আমোদ-প্রমোদের উল্লাস, আকাশ-বাতাস কেঁপে গেল। শয়তান নিজের ক্ষতেও ব্যাথা পেল, সামলে নিয়ে শয়তান আবার শুরু করল — ধর্মভাব ও ধর্মতত্বের প্রকাশ কোনো সময় এক সরলরেখায় হয়নি, পৃথিবীতে এর প্রকাশের গতি বিচিত্রভাবে ও বিচিত্ররূপে।

প্রথম গোত্রের আমলে লা-বিস নামে একজন অলস ব্যাক্তি ছিল যে চাষাবাদ গৃহনির্মান শিকার বা পশুপালন যা পরিশ্রম লাগে এমন কাজ করত না, করার ইচ্ছাও তার ছিল না। সে প্রচন্ড অলস ছিল কিন্তু তার প্রখর বুদ্ধি ছিল। সেকালে পরিশ্রম ছাড়া নিজের খাবার যোগড় হত না। লা-বিস প্রায়ই অনাহারে থাকত। লা-বিসের প্রধান চিন্তা ছিল বিনা পরিশ্রমের জীবিকা। নানা ফন্দি-ফিকির আঁটত তাতে কাজ হত না। একদিন সুযোগ এসে গেল। সেদিন গ্রীষ্মের পূর্ণিমার রাত, গোত্র প্রধানের বাড়ির চারদিকে বসে সকলে গল্প-গুজবে মত্ত। আলোচনা করছে তাদের কাজের কথা। এমন সময় ছায়া অন্ধকার দেখা দিল। একজন আকাশের দিকে চেয়ে চীৎকার করে উঠল ' দেখ দেখ রাতের দেবতা চাঁদকে দেখ, তার মুখ কালো যেন আকাশে এক কালো পাথর ঝুলে আছে। সকলে আকাশের দিকে তাকাল, দেখল সত্যিই রাতের দেবতা চাঁদের কোনো উজ্জ্বলতা নেই, সে এক কালো গোলাকার বল। পৃথিবীতে আলো কমে গেল, চারপাশের বাড়ি-ঘর গাছপালা সব কিছু আস্তে আস্তে হারিয়ে গেল। সকলে ভয়ে চীৎকার শুরু করল। লা-বিস সেখানে উপস্থিত ছিল। আগে এরকম ঘটনা সে দেখেছে। তার মনে ছিল কিছুক্ষণ পর চাঁদ পুরোন উজ্জ্বলতা ফিরে পাবে। মানুষের ভয়ে বিহ্বল অবস্থার সুযোগ সে নিল। উপস্থিত জনতার সামনে সে উঠে দাঁড়াল, আকাশের দিকে আঙুল তুলে গুরু গম্ভীর ভাষায় বলে উঠল, 'নতজানু হও, প্রার্থনা কর, 'অন্ধকারের দেবতা' আজ 'আলোর দেবতার' সাথে লড়াইয়ে নেমেছে। 'অন্ধকারের দেবতার' জয় হলে আমরা সকলে ধ্বংস হব, আলোর দেবতার জয়ে আমরা বাঁচব। প্রার্থনা করো, পরমেশ্বরের আরাধনা কর, চোখ বন্ধ রাখো আকাশের দিকে তাকাবে না। যে দুই দেবতার লড়াই দেখবে সে অন্ধ হয়ে যাবে আর মাথার গোলমাল হবে, অন্ধ ও পাগল থাকবে সারাজীবন। মাথা নীচু রেখে অন্তর থেকে প্রার্থনা করো, 'রাতের দেবতার' জয়। তার শত্রু, আমাদের শত্রু — মানুষের শত্রু।

লা-বিস নিজের চতুরতায় নিজেই অবাক, এমন কল্পকথা নিজেও কোনোদিন শোনেনি। ধীরে ধীরে চাঁদ তার উজ্জ্বলতা ফিরে পেল, লা-বিস আগের চেয়ে আরো উচ্চস্বরে ভাবগম্ভীর গলায় বলল, এখন মাথা তোল, দেখ রাতের দেবতা তার শত্রুর বিরুদ্ধে জয়ী হয়েছে, নক্ষত্র-তারার মধ্য দিয়ে এবার তার যাত্রা শুরু হবে। জেনে রাখ, তোমরা প্রার্থনা দিয়ে 'অন্ধকারের দেবতার' বিরুদ্ধে 'আলোর দেবতাকে' সাহায্য করেছ এতে 'আলোর দেবতা' খুশি, দেখ সে

আগের চেয়ে আরো উজ্জ্বল।

সকলে মুখ দেখল, অন্ধকার অবস্থা থেকে আলো দেখায় চাঁদের উজ্জ্বলতা বেশি বলে মনে হল। ভয় ভাব কেটে গেল, সকলে আনন্দ উৎসবে মেতে রইল সারারাত।

পরদিন লা-বিসকে ডেকে গোত্র প্রধান বলল, 'কোনদিন কেউ যা পারেনি তুমি করেছ, প্রমান করলে রহস্যের গোপন জ্ঞান তোমার আছে যা আমরা বুঝতে পারতাম না। সকলে চায় গোত্রে প্রধান পদের পর তোমার দ্বিতীয় স্থান হোক। আমি শক্তিশালী আর তুমি সবচেয়ে জ্ঞানী, তোমার জানা অনেক বেশি। ঈশ্বর ও আমাদের যোগাযোগ হোক তোমার মাধ্যমে। ঈশ্বরের ইচ্ছা ও কাজের ব্যাখ্যা দেবে তুমি, জানাবে কিভাবে ও কি উপায়ে ঈশ্বরের আশীর্বাদ আর দয়া পাওয়া যায়।' চতুর লা-বিস সঙ্গে সঙ্গে প্রধানকে আশ্বাস দিল 'আমার স্বর্গীয় স্বপনে ঈশ্বর আমায় যা জানাবে আপনার জাগরনে আমি ঠিক তাই জানাব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন ঈশ্বরের সাথে যোগাযোগ করে দেব।'

প্রধান আশ্বস্ত হল। উপহার দিল গরু-ঘোড়া-ভেড়া আর লা-বিসকে জানাল, 'লোকেরা তোমার জন্য সুন্দর বাড়ি তৈরি করে দেবে আর দেবে ফসলের এক অংশ যাতে তুমি আমাদের মধ্যে সম্মাননীয় ব্যাক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে জীবন যাপন করতে পার।' কথাবার্তা শেষের মুখে প্রধান আবার জানতে চাইল, 'কে ঐ দুঃসাহসি অন্ধকারের দেবতা যে রাতের দেবতার সঙ্গে লড়াই করল? আমরা আগে কখনও এমন দেখিনি বা এমন ভাবে ভাবিনি।'

'সে বহু পুরোন কথা, মানব জন্মের আগের কথা।' লা-বিস শুরু করল, 'সেই সময় সকল দেবতা উর্দ্ধজগতে শান্তিতে বাস করত। ঐ দেবতাদের একজন দেবতা আছে, যাকে মানব-ঈশ্বর পরমেশ্বর বলা হয়। দেবতারা তাকে পরমপিতা বলে। পরমেশ্বর সবকিছু জানে ও সবকিছু করতে পারে, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের রহস্য জ্ঞান তার নিজের কাছে গোপন আছে অন্য কাউকে জানায়নি।' একদিন, সেও অনেক পুরোন কথা, বাথার নামে এক দেবতা বিদ্রোহ করল। পরমপিতার সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আমরা কি চিরস্থায়ী নই? তোমার নিজের হাতে সব কর্তৃত্ব, এমনকি আমাদের কাছ থেকে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের রহস্য গোপন রেখেছ। রহস্যের জ্ঞান ও কর্তৃত্বের ভাগ দাও।' পরমপিতা ঘোষনা করল 'সর্বময় কর্তৃত্ব, ক্ষমতা ও গোপন রহস্য আমার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে কারণ আমিই আদি ও আমিই অন্ত।' বাথার এবার বলল রহস্য ও কর্তৃত্বের ভাগ না পেলে আমরা সকলে বিদ্রোহ করব। পরমপিতা সিংহাসনে বসে ভুবন কাঁপানো গলায় হুকুম দিল।' এখান থেকে বের হও। নেমে যাও ঐ মর্ত্যলোকে যেখানে দুঃখ কষ্ট আছে।'

বাথার নেমে এল মর্তে, সে প্রতিজ্ঞা করল মর্তলোকে বাস করে যারা দেবতাদের ভালবাসবে তাদের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেব, বিষে ভরে দেব হৃদয় যাতে তারা দেবতাদের কথা না মানে। এই ভাবে আমি প্রতিশোধ নেব। প্রধানের কপালে ভাঁজ পড়ল, চেহারা বিবর্ণ হল। 'খারাপ দেবতার নাম তাহলে বাথার।'

লা-বিস বলল,'না, না, দেবলোকে তার নাম ছিল বাথার। এখানে তার অনেক নাম। তবে সে শয়তান নামে বিখ্যাত।'

বার বার 'শয়তান' 'শয়তান' উচ্চারণ করল প্রধান, কিন্তু ভয়ে তার গলার স্বর বাতাসে শুকনো পাতা হেলার শব্দের মত শোনাল। 'কিন্তু শয়তান কেন মানুষের শত্রু, শয়তানের কোনো

ক্ষতি মানুষতো করে নি?' প্রধানের প্রশ্নে লা-বিস জানাল,'শয়তান মানুষকে ঘৃণা করে, কষ্ট দেয় কারণ মানুষ বাথারের দেবতা ভাইবোনেদের বংশধর। বাথারের আক্রোশ দেবতাদের উপর তার বিদ্রোহে সামিল না হওয়ার জন্য। শয়তান মানুষের বড় শত্রু, দিনে তাদের দুঃখ-কষ্টে ফেলে আর রাতে দুঃস্বপ্ন দেখায়। শয়তান এমন অশুভ শক্তি যে ঝড়কে বয়ে এনে মানুষের বাড়ি-ঘর ধ্বংস করে, ফসলের ক্ষতি করে, দুর্ভিক্ষ আনে। মানুষ ও গৃহপালিত পশুর মধ্যে রোগের জন্ম দিয়ে ক্ষতি করে। শয়তান সেই অশুভ শক্তি যে মানুষের দুঃখ কষ্টে আনন্দ করে আর মানুষের আনন্দে তার দুঃখ হয়।'

প্রধানের ভীত চেহারা দেখে লা-বিস প্রধানকে আশ্বাস দিল, 'আমি আমার জ্ঞান ও বিচার বুদ্ধি দিয়ে পরিস্থিতির বিচার বিশে-ষন করব, ঐ অশুভ শক্তিকে এড়িয়ে চলার পথ বের করব। যাতে আমরা শয়তানের বিছানো পথে না চলি।' এই কথা শুনে, লাঠির মাথার উপর ভর দিয়ে প্রধান চুপি চুপি বলল অশুভ শক্তির গোপন কথা তোমার কাছ থেকে জানলাম, গোত্রের সকলে জানবে। তুমি হবে সম্মাননীয় ও মহান।

প্রধানের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে লা-বিস ডেরায় ফিরে এল। নিজের সাফল্যে আজ সে খুশি। সেই দিন রাতে লা-বিস নিশ্চিন্তে ঘুমাল। সেই রাত থেকে অন্য সকলের ঘুমে যোগ দিল দুঃশ্চিন্তা, ভয়, দুঃস্বপ্ন। ফাদার শয়তানের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। মরনাপন্ন ব্যাক্তির মুখে যে হাসি লেগে থাকে ফাদারের ঠোঁটে সেই মৃত্যুহাসির আভা ফুটে উঠল।

শয়তানকে ব্যবসার পুঁজি করে সর্বপ্রথম লা-বিস্তা, এরপর তার বংশধরদের মধ্য দিয়ে ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। ধীরে ধীরে সংগঠিত হয়ে সাংগঠনিক রূপ পায়। এই ভাবে পৃথিবীতে যে ধর্মভাব, ধর্মতত্ব জন্ম নেয় শয়তানের অস্তিত্বই তার প্রধান কারণ।

লা-বিসের উত্তরাধিকার হিসাবে মানব-জীবন রঙ্গমঞ্চে তোমাদের শতরূপের সাজ — কেউ পরমেশ্বরের বরপুত্র, কেউ পরমেশ্বরের প্রতিনিধি, কেউ জ্ঞান-বৃক্ষ, কেউবা জীবন তপস্বী। তোমরা মানুষকে শোনাও তোতা পাখির বুলি 'মুক্তি যদি পেতে চাও বন্ধন মুক্ত হও,বিষয়-আশয়ের মোহ ত্যাগ করো।' মানুষকে শয়তান-খতম মন্ত্র, মুক্তির মন্ত্র, গোপন রহস্যের ব্যাখ্যান-এর উপদেশ শোনাও নানান সুরে। এমন কি সন্তানকে বলিদান করার উপদেশ দিতে তোমাদের দ্বিধা হয় না। মানুষের দুর্বলতার সুযোগ নাও, তাদের নতজানু করে আত্ম সমর্পনে বাধ্য কর। মানব জীবনে শয়তানের আধিপত্যের সাথে তোমাদের আধিপত্য বদলা-বদলি করার চেষ্টা, কিন্তু এ চেষ্টা বৃথা ফাদার।

তোমরা জান আমি চিরন্তন, মর্তলোকে আমার অস্তিত্ব অনন্তকাল পর্য্যন্ত যতদিন না সূর্য পুড়ে ছাই হয় বা তারা-নক্ষত্ররা খসে পড়ে। মানুষের অন্তরে আমার বাস, মানুষের মনে আমার নিঃশব্দ বিচরণ। মানুষের মনে ঘৃণা, বিদ্বেষ, ঈর্ষা লোভ আমি সৃষ্টি করি, আমার প্রলোভনে ওরা রঙিন স্বপ্ন বোনে। আমার প্রলোভন থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টাও মানুষের নিরন্তর, তার একান্ত ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা, নিজের মনের সঙ্গে অবিরাম তার নিজের যুদ্ধ, যে পারে সে নিজেই পারে কারও সাহায্য বা মাধ্যম ছাড়া। এই যুদ্ধে তার কখনও জয় কখনও বা পরাজয়, তবু তার যুদ্ধ চলে। তাই সাধুব্যক্তি প্রার্থনায় নিদ্রাহীন রাত কাটায় আর অন্যজন আমাকে সাথে নিয়ে নিশ্চিন্তে বিছানায় ঘুমায়। একদল নিজের কাজের জন্য আমায় দোষারোপ করে তীর্থস্থানে বিছানায় ঘুমায়।

একদল নিজের কাজের জন্য আমায় দোষারোপ করে তীর্থস্থানে ঘুরে বেড়ায় পাপস্খালনের আশায়, অন্যদল আমার সঙ্গ পাবার আশায় পাপ-স্থানে ঘোরাফেরা করে।

আমার প্রতি ঘৃণা ও আমার ভয়কে ভিত্তি করে যেমন তৈরি হয় উপাসনালয় তেমনি আমাকে ভাল বাসার ফসল হিসাবে গড়ে ওঠে শুড়িখানা। আমাকে ভালবাসার নিদর্শন হিসাবে মাথা তুলে দাঁড়ায় অহংকার, গর্ব ও লালসার প্রাসাদ। আমাকে কেন্দ্র করে মানুষের দর্শন, চিন্তা, সংস্কৃতি, ধর্মচর্চা ঘোরপাক খায়। আমি মানুষের চিন্তার খোরাক, ভালোমন্দ মাপার মাপকাঠি, আমি একবিন্দু 'শূন্য'। আমি না থাকলে মানবজীবন থেকে চলে যাবে পাপাচার, থাকবে না ভালোমন্দের পার্থক্য, মানুষের চলমান জীবন হবে নিস্তরঙ্গ। আঁধার থেকে আলোর দিকে যাবার মানুষের যে নিরন্তর প্রচেষ্টা তাও থেমে যাবে। মানুষের কাছে জীবনযাপন মনে হবে মরণপানে একঘেয়ে অর্থহীন যাত্রা।

পাপাচার শেষ হলে পাপাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সেনানীর কি আর প্রয়োজন থাকে, ফাদার?

কথা বলতে বলতে শয়তান ঝুঁকে দুহাত ফাদারের দিকে বাড়িয়ে দিল তারপর আবার বলল 'এতক্ষণ আমার অস্তিত্বে তোমাদের প্রয়োজনীয়তার কথা তোমায় জানালাম। আমি ক্লান্ত, মনে হয় আমার সময় শেষ হয়ে আসছে, এখন তোমার ইচ্ছা, শুশ্রুষা করে আমাকে বাঁচাতে সাহায্য করতে পার অথবা এই নির্জনে একা মরার জন্য ফেলে রেখে যেতে পার। আমি জানব, সেই অনন্তকালের সময় আমায় জন্য আজ শেষ।'

'অনন্তকাল শেষ' এই কথা শুনে ফাদারের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল, নিজের অজান্তে ক্ষমাসুলভ সুরে ফাদার বলা শুরু করল, 'বন্ধু আমার অজ্ঞানতাকে ক্ষমা কর। কিছুক্ষণ আগেও আমার এরকম ধারণা ছিল না। এখন আমি নিশ্চিত শয়তানের অস্তিত্ব সব প্রলোভনের কারণ আর এই প্রলোভনের পরিমাপেই হবে মানবতার মুল্যায়ন। তোমার অস্তিত্ব শেষ হলে প্রলোভন জয় করার মানুষের সহজাত মানসিক শক্তির আর প্রয়োজন হবে না, সঙ্গে সঙ্গে মানবিকতার মূল্যে নিজেকে উন্নত করার সহজাত প্রক্রিয়াও শেয় হবে। তোমার জীবনে মানব মুক্তির উপায় গাঁথা আছে বন্ধু। তোমার বেঁচে থাকা প্রয়োজন, নাহলে তোমার মৃত্যুর সঙ্গে সব পাপ লোপ পাবে। নরকের ভয় থাকবে না, ফলে মানুষ পরমেশ্বরের আরাধনা ভুলে যাবে। হে বন্ধু, তোমার প্রতি আমার ঘৃণাকে মানবতার মুক্তির স্বার্থে আমি বলি দিলাম।

'বন্ধু' ডাক শুনে শয়তান খুশি হল, 'যাক আমাদের মধ্যের বন্ধন আজ স্বীকৃতি পেল। এসো বন্ধু দেরি না করে আমাকে তোমার ঘরে নিয়ে চল।' ফাদার সামান তার জোব্বা গুটিয়ে শয়তানের দেহ কাঁধে তুলে নিল। এমন ভারের বোঝা ফাদার কোনদিন বহন করেনি, দেহের ভারে ঝুঁকে পড়ল। ফাদার তবু থামল না চলা শুরু করল।

সূর্যের আলো শেষ। বনের ছায়া এখন ঘন অন্ধকার। ফাদার ধীরে ধীরে তার ঘরের দিকে চলেছে। তার কাঁধে শয়তানের দেহ। তার জোব্বা রক্তে লাল। চলতে চলতে ফাদার বিড় বিড় করছে, 'হে পরমেশ্বর, শয়তানকে বাঁচিয়ে রাখ, বাঁচিয়ে রাখ(শয়তান বেঁচে থাক।'

রমা ঘোষ / জবা

লোভের আগুনে সেঁকা শ-থ মুখে
রিরংসার খানাখন্দ ছলনার কাটাকুটি দাগ
কাঁটার লাঞ্ছনা দুঃখ অপমানভার।
ভোরের লাবণ্য সেই — নদীস্রোত — আম্রবনচ্ছায়া
আঙিনায় অবিরত আরক্তকুসুম
সে অন্য ঋতুর গল্প
কবেই গিয়েছে ছিঁড়ে সেতারের তার,
কাজ নেই প্রসাধনে
আরসি ভেঙে
সুরবালা চলে যায় লোকালয় ছেড়ে
একটি বিবর্ণ চুল ভেসে যায় শীতের হাওয়ায়।

রামকিশোর ভট্টাচার্য / অপেক্ষা

পক্ষিরাজের অভিনয় আমরা কেউ ধরতেই পারিনা
অথচ রাজকুমারের মুখে চৈত্রের মেঘ দেখে আমাদের
সুস্থির জীবন পিলসুজের ওপর থিরথিরিয়ে ওঠে...

আগুনের দানাগুলি খেতে খেতে পক্ষিরাজ হালুম ডাকে,
তেপান্তরের গায়ে লেগে থাকা অন্ধকার ফেটে উঠে আসে —
লাল পিঁপড়ের সারি। একটা লাল রিবন বাঁধা পথ শশক চোখে
দেখছে জ্যোৎস্না কলোনীর দিকে। একটা ফাৎনা নাচছে —
রূপকথা সুরে। হাততালিতে ফেটে যাচ্ছে রূপ বর্ণিত
কথা প্রসঙ্গ। রূপ আমাদের জড়োয়ামুখি জীবন, আদর করলেই
আলো ছড়ায়। গল্পের বাজারে পুরনো সোনার দামে বিক্রি হয়।

মহাপ্রলয়ের পর কোনো এক স্বপ্নপার্লারে রাজকুমারী
শ্রাবণ সেজে বসে থাকে —
আপন ভোলা নৌকার অপেক্ষায়...

কাশীনাথ ঘোষ / বিশ্বায়ন প্রেম পদাবলী

সখা বললেন — বন্ধু ব্রহ্মাস্ত্র নামিয়ে রাখো
আমরা যুদ্ধ চাইনা, দেখছোনা
যুবক ললাটে আর যুবতী আঁচলে মাখা
বিশ্বয়নের রামধনু আলো।

কি ভাষায় লিখেছো সকাল, এসো
দূরদর্শন আলো মেখে নিয়ে লিখি
প্রেম পদাবলী
প্রেম সাদা-কালো জাত-পাত মানে না কোনটাই
সটান জড়িয়ে ধরে দুটো সাপের মত

যৌন মিলন নয় — বল শঙ্খ লেগেছে
বিস্ফারিত বিস্ময় নয়, অঙ্গরাত্তিকরণ হোক সবটুকু...

এ কেমন চিন্তা তোমার
এঁটো হয়ে যাচ্ছে সংস্কৃতি!
শঙ্খ মিলন বস্ত্রে কত জাদু আছে জান
জান কত অনায়াস লভ্য হয় সবকিছু

তোমার বাড়ির পলেস্তারা খসে পড়ছে
নতুন বছরে ওয়েদার কোট না ধরালে
এমনিই একদিন ভেঙে পড়বে
সাধের কৃষ(কলি অট্টালিকা,
চাপা পড়ে মরার আগে অন্তত
পারিপার্শ্বিক শব্দ বাকলে রাখো
কমনীয় ঠোঁট।
যুদ্ধ চাই না ব্রহ্মাস্ত্র নামিয়ে রাখো
শঙ্খ মিলন বস্ত্রে দেখ কত জাদু লেগে আছে।

মৃদুল দাশগুপ্ত / আয়নার অভিপ্রায়

আয়নার অভিপ্রায়ে রাত্রি এনে মুছে দিই মুখের অর্ধেক
পক্ষপাত যাতে জাগে, তোমাকে বিভ্রমে ফেলে ফের ভেসে উঠি!
সূর্যের সমাধিক্ষেত্রে আমাদের গোপন প্রণয়
লোকচক্ষু মানে না এখন!
লবণের মধ্যে থেকে আমরা নিজেরা মিশি সমস্ত রান্নায়।

তোমার বয়স কতো মনে নেই। অর্ধেক রয়েছে চিহ্ন
অবিভক্ত বাংলা ভাষায়

বুদ্ধদেব বন্দ্যোপাধ্যায় / তোমার প্রবাহে

তোমার প্রবাহের কাছে নতজানু হওয়ার কথা ছিল
অথচ এক একটা দিন রক্তের রেণু মেখে উন্মাদ
লালগড় থেকে শালবনি, হাওয়া নিশান থেকে পাখি পাহাড়
বাতাসের কানে কানে অজস্র পতনের দাপাদাপি
চোখের সামনে ভেঙে পড়ছে স্বপ্নের ইমারত
তবে কী কোথাও কিছু ভুল হয়েছিল?
দোহাই, এভাবে তুমি বসিও না ঘাতকের পাশে
আরও একবার এসো, নতজানু হই তোমার প্রবাহে

অভিজিৎ মিত্র / ঘরানা

শীত মানে এক পে-ট রোদ্দুর
মাথার পাশাপাশি যখন সবুজের দুপুর পাহারায়
শালিখেরা ব্যলকনির আদরে
গৌহাটি ডাকছে
নিচে একফালি রোগা স্টিকার
মাথা নড়ার আগে
একজন আলো ধোবে
যার এবিন্দু ওবিন্দুর মাঝে রেখা
গলে পড়ার সময়
সরল হবে একটু হবে
বিকেলঘরানা

সোমক দাস / গন্তব্য

এই যে, 'কিছুই হল না' মনে হয় মাঝে মাঝে, মনে রেখো —
ওসব, আসলে, ওয়েদার। গভীর গ্রীষ্মের দিকে
ওরকম কখনো হয় না। খুব বেশি শীতের মধ্যেও
তেমন কোনো ঝামেলা নেই, লোকে বলে।
মুশকিল হল বসন্ত কখন আসে কেউ ঠিক বলতে পারে না বলে
শীত কখন চলে যাবে তাও কেউ বলতে পারে না,
মন খারাপ কখন বাড়বে কেউ কি তা জানে।
এই যে, 'রাজার মত বেঁচে আছি' মনে হয় মাঝে মাঝে, মনে রেখো —
ওসব, আসলে, টেম্পোরারি। জীবনের আসল কথা হল —
কোনো অনুভূতিই দীর্ঘস্থায়ী হয় না।
'কিছুই হল না' থেকে 'রাজার মত বেঁছে আছি'র মাঝখানে
ফিরে আসতে হবে বার বার।

সোমনাথ মুখোপাধ্যায় / আবার কবিতা লিখি

আবার কবিতা লিখি সেই পূর্বের মতোন জ্বলন্ত কুন্ডের
পাশে আঙুল ঝলসে ওঠার মুহূর্তে
এক কোশ জলের ঝাপটায়...
ভুলভাল জীবনের
দাঁড়ি নেই কমা নেই ... এমনই একটানা এক
অশুদ্ধ বানানে গড়া পরীক্ষায় অনুত্তীর্ন খাতা
ছুঁড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছে হয়
অথই জলের নীচে ঘুমোবার প্রয়াস জন্মায়
তার আগে একটা কবিতা লিখি... আর একবার
শুধু একবার...

ঈশিতা ভাদুড়ী / তোমার আমার

তোমার আমার রোদ্দুর সকাল
আমার সারাদিন বৃষ্টি মেঘ-মেঘ গন্ধ
তোমার আমার চৈত্রমাস আমের মুকুল
নদীর পরে নদী তোমার আমার স্বপ্ন

গৌতম মজুমদার / গান নয়(শুধু যাওয়া

রৌরবের ভিতর থেকে উঠে আসছে ভীমভল্লা
বুদ্বুদ তা-ও কি জানে না?
অজ্ঞাতবাসের নিশান, সোনার প্রস্তর পাত্র
কার মুখে শুনেছিল হাওয়ার বুদ্বুদ
তাকে চেনো? ... তুমিও জানো না।
অলীক বচন শুনে দিন যায় অসহ রঙিন
সারাদিন ভিক্ষেজীবী থেকেও যে দেয়
অমেয় কৌতুক, তার কাছে আরও প্রত্যাশা?

এসব কল্পনা মাত্র ... আকাঙ্ক্ষার বিষধোঁয়া
ধুয়ে মুছে নীল করে কুবাতাস
সফেন সাগরে যেন অগন্য বুদ্বুদ ...

আফজল আলি / তাজমহল

রাত ঘুমিয়ে গেলে বৃদ্ধ শাহাজান
খালি হাতে প-াস্টার করে সৌধ
খুব ভোরে যে পাখি গাইতে জানে
তার মুখে শোনা যায় এই আকরিক সুর
চার ফোঁটা জল।

বিকাশ চক্রবর্তী / নিস্পৃহ

ভাবনাবর্তের বৃত্তের মাঝে দাঁড়িয়ে দেখি বৃত্তের
বাইরের গোলার্দ্ধে ছুটছে আমার পূর্বাপর কিছু
চেনামুখ, একদিন যারা বৃত্তের মাঝে থেকে
আমাকে বৃত্তের বাইরে চাবুক মারা ঘোড়ার মতো
ছুটিয়ে ছিল, আর হাঃ হাঃ হাঃ করে হেসেছিল(
সত্যি বলছি বিশ্বাস করুণ! আমি কখনো তেমন
করে কিছু হতে বা পেতে চাইনি, কিন্তু, আমার-ই
ভাবনাবর্তে আমি বহুজনার মধ্যে থেকেও একাকীত্ব
হাতড়ে বেরাই(হয়তো এটাকে আপনারা রোগ
বলবেন, জানি(কিন্তু বিশ্বাস করুণ — বোধ হয়
প্রত্যেক মানুষের কিছু কিছু সময় খুব নিজের,
খুব আপনার, খুব সংগোপনের হয়ে যায়, তার
ভাগীদার আর কাউকে করা যায় না(তখন বাবা-মা,
স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, ভাই-বোন, সবার থেকে কিছুটা
তফাতে সে থাকতে চাছ(কল্পনার বেড়াজালে
নিজের আর দোসরের ঘর সাজায়, সেই সময়
অন্য কেউ সেই ঘর ভাঙতে এলে, তার কল্পনার
পৃথিবীতে নিজেকে সবচেয়ে বড় অপরাধী, বড় অসহায়,
বড় দুর্ভাগা বলে মনে হয়(তবু সে জীবনের নিস্পৃহ
চেতনাতে জীবনেরই হুড়ু-ফলস্ দ্যাখে।

গোপাল আদক / প্রেম রোদে ভিজে হয়েছি ফেরার

বৈষ(ব সাহিত্য প্রেমরোদে অনুভূতি ভিটামিন ডি হয়ে থাকে,
ফাগুনস্পর্শ দোল বাহানায় নিয়ে আসে আরো কাছাকাছি,
শুকনো আলাপচারিতায় কথাজোয়ার, রাতভোর রিংটোন বৃষ্টি,
নাগোরদোলায় দুলে ওঠে রাসজীবন, বরফ আঙুলের অসাড় মাখন
ভ্রমণ, প্রচুর কাটাকুটি খেলা, প্রিয়বান্ধবীর বক্ষযুগলেই যৌবন
প্রাপ্তি, নিটোল নাভিটির নিচেই শব্দকামসূত্র, খাজুরাহোছন্দ,
সেই উষ(শরীরী খেজুর রসে ডুবতে থাকি তো ডুবতেই থাকি,
ফিরিনিকো আর হয়তো ফিরতে চাইনি বলেই...

কাঁচ গ্রন্থে লিখে রাখি চকোলেট স্মৃতি...

সুদক্ষি ণা / সিংহবাহিনী

আজ কোনো জানলায় রোদ ওঠেনি। তোমার লোহার তপ্ত
ও মসৃণ তালুতে পাখির বুকের মতো হাত ঘসে ঘসে
ফিরিয়ে আনছি সঞ্চালন। তুমি ভারি বাধ্য ছেলে। অথবা
বলছ নাও চালাবার ক্ষমতা তোমার একার, মাঝে মধ্যে
দেখিয়ে দিই পাখির ছোট্ট কবোষে(কতখানি
প্রভুত্বের আস্পর্ধা আছে। হা হা হাসতে হাসতে
আমার পায়ের নখ তোমার মাথা ছাড়িয়ে যাবে,
হঠাৎ বৃহদায়তন আমি থেকে ফেটে ঝুরঝুরিয়ে পড়বে
কয়েকশো কোটি কাঁকড়া, সরসর করে চলে যাবে
জলের দিকে, তবে তো তুমি জানবে, আমি সমুদ্রের
দেবী ক্যালিপ্সো, কিন্তু তারও আগে তোমাকে
জোগাড় করতে হবে অষ্টাঙ্কৃত নটি সিক্কা, যা
জড়ো করে, পুড়িয়ে তুমি সপ্রেমে বলবে — তোমাকে
অন্তর থেকে স্বাধীন করে দিচ্ছি, দেবী, এত প্রেম
যে করতল ঢুকে যাবে ফ্লুইডে, বার করে আনলে
দেখবে তর্জনী ও মধ্যমা জুড়ে দিয়েছি সাদা
জেলি, যার সজ্জায় চেয়ে আছে আমার ডিম্বের
চোখ, তারা তোমায় ডাকছে। তুমিও ঠোঁটের কোনে
ঝিলিক মেরে — আচ্ছা রে— বলে মৃদু পাক
খেয়ে ধারণ করবে সিংহমূর্তি। তারপর হিমরাত্রি ধরে
প্রান্তরের আবছায়ায় লড়বে এক সিংহ ও কর্কট,
ভোরবেলা গিয়ে মানুষজন দেখে আসবে ঘাস
পুড়ে পুড়ে জোনাকির আলো লেগে আছে।

শমিত বন্দ্যোপাধ্যায়
বন্ধুর জন্য দুটি নদী

১. চলো, লেটস গো।

কোথায় শেষ পর্যন্ত নিয়ে যাবে গো দাদা?

এই যে দিনগুলো রাতগুলো একটানা
পার হয়ে যাচ্ছি,
এই স্রোতে আঁজলা আঁজলা জল ঢেলে
কোন সে বাঁধ টপকে তুমি আমাদের
নিয়ে যেতে পারো ?

২. আয় তোকে ছুঁই সরস্বতীর ধারে
যদিও সে নদী আকাশে বেড়াতে গেছে
তার ফাঁকা ঘরে ক্ষণেক জিরিয়ে আসি—

না হয় দুজনে সে-খাত খুঁড়িয়া রাখি
একদিন ফের নদীটি বহিয়া যাবে
ঐ দেখ্, তীরে জনপদ জেগে আছে
ওপারে এখনও শস্যের সীমারেখা।

যাবি নাকি ফিরে দেবতার বাঁধা ঘরে?
নাকি ফিরে যাবি যেখানে এখনও নদী?
নৌকা তোকেতো ঠিকই পৌছে দেবে
রাস্তার শেষে রাস্তা যেখানে শুরু...

মধুছন্দা মৈত্র
শুদ্ধ পত্রাবলী

আয়নায় এই প্রথম দেখি
একেবারে ভেজা শরীর
অঙ্গে সুতোটি নেই
শুধু যেন শূন্য প্রদর্শনী।

কতটা ক্লান্ত হলে
চোখের নীচে কৃষ(সায়র
করুণ কুণ্ঠা যেন
চামড়া ভেদ করে
অনেক প্রতীক্ষায় শ্রান্ত
নর্ম সহচরী বাদামী বকুল
আজ দেখি আনত বদন।

যদি জুনের গ্রীষ্মাবসানে
ঝড় ওঠে সান্ধ্য পর্যটনে
তবে, তাকে দোষ কেন বল?

বর্ষা তো চিঠি লিখে আসেনি
স্কুল ইউনিফর্মে ফেরাটা জরুরী।

ডাঃ সমীর মুখোপাধ্যায়
দীর্ঘশ্বাস

গর্তে লুকিয়ে সকাল,
মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে —
ইঁদুরের লেজে
আটকে রাখে
ভারতীয় দীর্ঘশ্বাস।

ঘুমিয়ে পড়লে
প্রসাধনী দুপুর
ঝুঁটি বেঁধে
আমার বুকে
সাঁতরে যাওয়া হাঁস।

তপন বসু / জ্যোৎস্না - বাসর

শীতে জড়সড় ঘুমিয়ে পড়া গ্রামের শরীরে তখন
মাঘী-পূর্ণিমার নরম আলোর চাদর রাখা পরিপাটি।
একাকী ইঁদুরের গর্তে চোখরাখা পেঁচার মতন
মাঝির লক্ষ্য শুধু জালে জড়িয়ে যাওয়া মাছে।
চাঁদের সমুখে বাবলা-শিরিষের বন নদীর চড়ায়
রহস্যময় কারো অপেক্ষায়।
জেগে আছে জোনাকির বর্ণমালায় পতঙ্গের চোখ,
সত্যি অভিমানে বহুদিন চলে গেছে যে লোক
তার গোপন ঠিকানা বলে দেবে সে —
যে বাতাসে শিরিষের ডালে দোল খায় ঝুলন্ত বাদুড়।

নদী-ভেজা বালির চড়ায় মধুর জ্যোৎস্না-বাসরে —
নীল নক্ষত্রের ধারকরা পাখনায় নেমে আসা পরীরা
হয়তো পায়ের ছাপ রেখে হেঁটে যায় ...
জলে ভেঙে পড়া চাঁদ চুম্বন করে অলৌকিক মায়ায়।
অন্ধকার বনে
ঘুমন্ত পাখির ডানায় স্নেহ-রঙ দিয়ে যায় একান্ত গোপনে।
সকালে পরীদের গন্ধমাখা রাধাচূড়া ফুলে,
তুমিই ধূসর মুখে স্বপ্ন রাখো তুলে।

শাশ্বতী দে / প্রবাহ

ভেঙে যাওয়ার শব্দ
স্পষ্ট হয় তোমার অবহে।
কেবলই ভাঙছি আমি
চেতনার অনন্ত আবেশে।

চাঁদের শুদ্ধতা
আঁজলা ভরে তুলে
মোছাব তোমার মুখ
আমার সুরের বন্দিশে।

জগদীশ শর্মা / ভয়

হরিণ, কাকে ভয় পাও
— মানুষকে
চড়ুই তুমি?
— মানুষকেই

বাঘ তুমি কাকে ভয় পাও
— মানুষকে
মানুষ তুমি?
— মানুষকেই।

অশোক মুখোপাধ্যায়

স্মৃতি গাছ ও পঁচিশে বৈশাখের বেবি

আলো আঁধারের কালভার্ট থেকে দ্রুত সরে এসে
ভাঙা অডিটরিয়ামের দিকে পা রাখি।
সেখানে দেখা হয় সাদা পাহাড়-বৃষ্টির সঙ্গে।
পাহাড় বৃষ্টিটা একদিন আমাকে মহাশূন্যের পিঠে চাপিয়ে
দেখিয়েছিল পৃথিবীর সব নির্জনতাকেন্দ্রিক স্মৃতিগাছ
যার ভেতর আন্দোলিত গেস্ট-হাউসগুলি নড়ছিল
আমি স্বপ্নসরনিতে খুঁজছিলাম হারানো পংক্তি পাখিটিকে।

ওই সাদা পাহাড় বৃষ্টি আমার স্মৃতিগাছ ধরে নাড়া দিল
ঝরে পড়ল ডিমের ঋতুস্রাব
আমি অবিকৃত হাতে কুড়িয়ে নিলাম পঁচিশে বৈশাখের বেবি।
সেই বেবি এখন হাঁটছে, ঘুরছে ফিরছে।

চারপাশে কেউ নয়, শুধু পোজ অনুভব
পদ্মকাটা থালার মতো বৃত্ত থেকে বৃত্ত যেতে যেতে
জলতৃষ(ায় নিমগ্ন নদীর মতো টার খেতে খেতে
বলে উঠছে আমাকে এ সহবাস থেকে পৃথক করো,
 দেখবে আমি আজো সেই স্কুলছুট নীল চাঁদ।

বোধিসত্ত্ব বন্দ্যোপাধ্যায় / বিপদ সীমারেখায়

যে হেতু আমি এসেছিলাম
সে হেতু আমায় চলে যেতে হবে
আমার অন্তর্জলি যাত্রার আগে
নিজেকে ভিজিয়ে নিও
না হলে কোন প্রচ্ছন্ন আগুন স্পর্শে
প্রান্ত সীমার নিকটে দাঁড়িয়ে তোমার শরীর
ঝলসে যেতে পারে।

পাপড়ি ভট্টচার্য / আরও একটা সাত

অবাক শব্দের বাক তরল হতে হতে আর
শালীনতা রইলনা।
এমনই চাইছিলাম, ফেলে আসা কত সাত
এসব দিতে পারেনি,
সাতের পেলবতা ময়ামের মত জীবনে
দাঁড়িয়ে আজও ভেজে।

তুমুল বৃষ্টির ভেতর অর্থহীন ছাতা মহার্ঘ
ধরে দাঁড়াতেই হয়
তোমার ঘর আর তুমি বসে রোজ
গল্প করো চাঁদের সঙ্গে
এভাবেই প্রতি মাসে কত সাত পেরোয়
আর রোদ্দুরে ঘেমে নেয়ে পাশে বসে থাকে
সাত সমুদ্র তেরো নদীর রাজকন্যা।

গৌতম সরকার / রাত্রি (শেষ প্রহর)

ঐ যে আকাশে ছড়ানো নক্ষত্র। আসলে
নক্ষত্র নয়, — আমার সাজানো সংসার,
ঐ যে গাছের মাথায় জমে থাকা অন্ধকার। আসলে
অন্ধকার নয়, — আমার অভিমান,
ঐ যে দূরের শহর সেজে উঠেছে মালায়, আলোয়। আসলে
আলো নয় — আমার দুঃখের উল্লাস...

তোকেই ভোরের আকাশ ভেবে আবার
ছুঁড়ে দিই কষ্টে জমানো শব্দ দানাগুলি।